ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌতু পূজ্যপূজানুসারতঃ। ৫।
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্ব-স্বপ্নোহীয়তে যথা। ৬।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোয় মখিলং জগৎ
ঈশজীবাদিরূপেন চেতনাচেতনাত্মকং। ৭।

(পঞ্চদশী)

পুরুষ সূক্তে বিশ্বরূপাধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের বিরাট রূপের অবয়ব। ১। ঈশ্বর সূত্রাত্মা বিরাট ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র অগ্নি বিঘ্ন ভৈরব মৈরাল মারিক যক্ষ রাক্ষস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র গো অশ্ব মৃগ পক্ষী, অশ্বত্থ বট আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ, যব ব্রীহি তৃণ প্রভৃতি শস্য, জল পাষাণ মৃত্তিকা কাষ্ঠ বাস্য (বাইস) কুদ্দাল প্রভৃতি এ সমস্তই ঈশ্বর, ঈশ্বর স্বরূপে পূজা করিলেই ইহাঁরা স্ব স্ব যন্ত্রে অধিষ্ঠিত শক্তি অনুসারে ফল বিধান করিয়া থাকেন। ৪। পূজক, তাঁহাকে যে যে যন্ত্রে যেরূপ যেরূপ পূজা করিবেন, পূজার ফলও সেইরূপ সেইরূপ লাভ করিবেন; ফলের যাহা কিছু উৎকর্ষ অপকর্ষ লক্ষিত হয়, সে কেবল পূজনীয় যন্ত্রের স্বরূপ এবং সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণভেদে পূজার তারতম্য অনুসারে, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি কখনও হইবে না, যেমন নিজের প্রবোধ ব্যতিরেকে কিছুতেই নিজের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে উপস্থিত হইলে, তখন ঈশ্বর জীব ইত্যাদি রূপে চেতনাচেতনাত্মক এই নিখিল জগৎ স্বপ্ন বই আর কিছুই নহে। ৫। ৬। ৭। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতি ত্রিবিধ কারণ— ১ বেদান্তদর্শনসিদ্ধ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। ২ যোগানুষ্ঠান। ৩ ভক্তিকে অবলম্বন রাখিয়া কর্ম্ম যোগ জ্ঞান এই ত্রিতয়ের সংমিশ্রণ রূপ সাধনা। এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে শেষোক্ত উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম, মধুর, শীঘ্র ফলপ্রদ এবং বিষয়ী বিরক্ত মুমুক্ষু এই ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষেই উপযোগী। ভক্তকুলের সেই উপাসনাকাণ্ডের অবলম্বন জন্য পরমদেবতা

পরমেশ্বরী সর্ব্বশক্তির কেন্দ্ররূপে স্বয়ং যে সকল স্বরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সেই সকল স্বরূপই ভক্তির জ্যের একমাত্র পরমারাধ্য পরমতত্ত্ব। ব্রহ্মা হইতে তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যে বিরাট-বিভূতি কীর্ত্তিত হইল, সেই সকল খণ্ড খণ্ড বিভূতির সিদ্ধি লাভ করিয়া যাঁহারা চরিতার্থ নহেন, ঐকান্তিক ভক্তি বা মুক্তির জন্য যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল, তন্ত্রোক্ত চরমা সিদ্ধি কেবল তাঁহাদিগেরই করতলে নৃত্য করেন। পরব্রহ্মরূপিণীর তন্ত্রোক্ত পরব্রহ্ম স্বরূপের উপাসনায় কেবল তাঁহারাই অধিকারী। তাঁহাদিগের জন্যই কেবল তুরীয় চৈতন্যরূপিণী ত্রিজগজ্জননী চিদ্ঘনানন্দ লীলাময় ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—তাঁহাদিগের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন——

কুলধর্ম্মমহামার্গে গত্বা মুক্তিপুরীং ব্রজেৎ
অচিরান্নাত্র সন্দেহ স্তস্মাৎ কৌলং সমাশ্রয়েৎ।

গুণলীলা।

গুণাতীত নিষ্কলতত্ত্বস্বরূপ হইয়াও অনন্তগুণমন্থর-মধুর-মূর্ত্তিধর, তমোগুণময় হইয়াও তমোগুণের নিয়ন্তা একমাত্র অধীশ্বর, তমোগুণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও স্বপ্রকাশ রজতাচল—শুভ্রসুন্দর, তমোময় হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান—পরমগুরু, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও মহাশ্মশানগোচর, মহাপ্রলয়-মহারুদ্র হইয়াও অপার-স্থিরগম্ভীর-মহাশান্তিসাগর, নিজানন্দে অধীর হইয়াও নিজসাধনানন্দ নির্ভর, বিরূপাক্ষ হইয়াও করুণাময়-প্রেমদর্শন, নিজে ত্রিজগতের উপাস্য হইয়াও নিজ উপাসনার পথপ্রদর্শক, নিত্য নির্দ্বন্দ্ব হইয়াও নগেন্দ্রনন্দিনীর অর্দ্ধাঙ্গহর, নিঃসঙ্গ হইয়াও নিত্যসঙ্গিনীর সঙ্গসাধক, নিত্যকান্তকান্তা-যুগলমূর্ত্তিধর হইয়াও কামান্তকর; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা হইয়াও কাশীক্ষেত্রে অযাচক জীবমাত্রের চিরকৈবল্য ফল বিধাতা, উগ্র হইয়াও আশুতোষ, শুভ্র হইয়াও নীলকণ্ঠ, ত্রিলোক সংহারকর্ত্তা হইয়াও কালকূট-পানচ্ছলে ত্রৈলোক্যরক্ষাকর, ভস্মধূস-

রিতদেহে চিরবৈরাগ্যপ্রদর্শক হইয়াও ভুজঙ্গভূষণে বিলাসলীলাধর ; জটাজুট-বিমণ্ডিত হইয়াও চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখর, বরাভয়ধর হইয়াও ত্রিশূল-পরশুপাণি, ভক্তমুক্তিবিধায়ী হইয়াও মুক্তকেশীর চরণতলশায়ী, পূর্ণানন্দ হইয়াও কারণানন্দপায়ী মহাভৈরব, ভৈরব হইয়াও মাভৈ-রব, সহস্রশীর্ষা হইয়াও পঞ্চানন, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ হইয়াও ত্রিলোচন, অম্বরমূর্ত্তি হইয়াও দিগম্বর, অষ্ট-মূর্ত্তি হইয়াও অনন্তমূর্ত্তি, জ্ঞানরূপ হইয়াও জ্ঞানগুরু, মুক্তিপ্রাপ্য হইয়াও মুক্তিপ্রাপক, জগৎপতি হইয়াও কৈলাস-কাশীপতি, ভূতনাথ হইয়াও ভূত-পতি, পশুপাশ-বিনাশকারী হইয়াও পশুপতি, ললাটলোচনে বহ্নিধর হইয়াও জটাজুটে গঙ্গাধর ; সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর হইয়াও দক্ষযজ্ঞ-বিধ্বংসন, মায়ামোহের পারান্তর হইয়াও দেবীবিয়োগ-লীলাকাতর, সর্ব্বসম্বন্ধ-গন্ধহীন হইয়াও গিরীন্দ্র-জামাতা, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভবনিদান লিঙ্গরূপী পরব্রহ্ম হইয়াও কুমার-হেরম্ব পিতা, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগগম্য হইয়াও যোগনিদ্রার নিত্যনায়ক, ত্রৈ-লোক্য সংহারকর্ত্তা হইয়াও ভক্তভুবনের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞানীর লভ্য হইয়াও ভক্তের নিত্যসহচর, ত্রৈলোক্যনাথ হইয়াও অনাথনাথ, বিশ্ববিভু হইয়াও দীনবন্ধু, বিশ্ববৎসল হইয়াও শরণাগতবৎসল, নিখিল মন্ত্র যন্ত্রের আরাধ্য হইয়াও তন্ত্র মন্ত্রের একমাত্র অধীশ্বর, অনন্তভুবনে একেশ্বর হইয়াও প্রত্যেক ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে চির-রাজরাজেশ্বর।

আবার— দ্বৈততরঙ্গ-বিকার রহিত হইয়াও কপট শঠ নটবর, ভাববিকার-বহির্ভূত হইয়াও ত্রিভঙ্গমধুর-মূর্ত্তিধর, শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইয়াও সজলজলদ-শ্যামসুন্দর, সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ভূভারহরণচ্ছলে ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপে অবতীর্ণ, পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও গুঞ্জাফল-মালাধর, বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীর আরাধ্য হইয়াও বৃন্দাবন-ধূলিধূসরিত, ত্রিলোকপালক হইয়াও গোপাল গোপবালক, বিশ্বম্ভর হইয়াও বিপ্রপত্নীর অন্নভিক্ষুক, অনন্ত শোভার আধার হইয়াও শিখিপুচ্ছ-শোভাধর, মায়াবরণের অতীত হইয়াও পীতাম্বর-বদ্ধকটি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সহায় হইয়াও বলরাম-সহায়বান্, যোগীন্দ্রগণের হৃদয়চারী হইয়াও গোপগোষ্ঠ-বিহারকারী, অনন্ত জগতের

আধার হইয়াও গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, প্রশান্ত মদনমোহন হইয়াও কংস-কালিয়-দর্পদমন, বালগোপালমূর্ত্তি হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর দামোদর, হরিহরব্রহ্মরূপে অভিন্ন হইয়াও ব্রহ্মসম্মোহন কর, স্বয়ং ভয়ের ভয়স্বরূপ অভয়তত্ত্ব হইয়াও প্রেমগুণে যশোদাভয়বিহ্বল, অনন্ত ভুবনের প্রতি-পরমাণুতে অনুস্যূত হইয়াও নিত্যবৃন্দাবনচর, লজ্জাধর্ম্ম-ভয়কাতরা দ্রৌপ-দীর অসংখ্য-বসনবিধানকারী হইয়াও কাত্যায়নী-ব্রতসিদ্ধা-কিশোরী-কুলের বসনহারী, নাদবিন্দুধ্বনি-মূর্চ্ছনার নিদান হইয়াও বংশীধ্বনি-বিনোদন, মহারস স্বরূপ হইয়াও নিত্যরাস-রসোৎসুক, নিত্যানন্দপরিপূর্ণ হইয়াও রাধিকা-মান-কাতর, মহাপ্রেম-সাধিকার সাধ্য হইয়াও রাধিকার নিত্যসাধক, নিত্যমুক্ত নির্লিপ্ত নির্গুণ হইয়াও ব্রজপুর-সুন্দরীকুলের প্রেমগুণে নিত্যবদ্ধ, কামদোষ-লেশবর্জ্জিত হইয়াও কামিনীকুলের কামকেলি-সুপণ্ডিত, কামতরঙ্গ-মধ্যমগ্ন হইয়াও কামসমরবিজয়ী কুমার, এক অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র হইয়াও অসংখ্য গোপীমণ্ডলীর অসংখ্যযূথে প্রত্যেকের নিকটে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্বিতীয়, নর-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াও ব্রহ্মলীলায় অধীর উন্মত্ত, সাধনহীন দুর্ভাগ্য জীবের মোহবিধানচ্ছলে নিজদারামণ্ডলেও পরদারত্ব-প্রতিপন্নকারী, সংসার-ধর্ম্মসেতুর রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও সাধনধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি-নির্দ্দেশকর্ত্তা, উভয়-ধর্ম্মের স্রষ্টা হইয়াও সংসারধর্ম্ম বিধ্বস্ত করিয়া সাধনধর্ম্মের বিজয়ধ্বজার উদ্ধর্ত্তা, আবার লোক রক্ষার প্রবর্ত্তনচ্ছলে ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের বিধানকর্ত্তা হইয়াও ধর্ম্মের পক্ষপাতী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়াও পাণ্ডবকুলে নিত্য-সখা, কর্ম্মী যোগী জ্ঞানীর আরাধ্য হইলেও ভক্তের জীবনসর্ব্বস্ব, অশরণ-শরণ হইয়াও স্বয়ং ভক্ত-শরণাগত।

আবার— সেই নিখিলশক্তির সমষ্টিস্বরূপিণী গুণাতীতা হইয়াও অনন্তগুণ-ধারিণী, অদ্বৈতরূপিণী হইয়াও দ্বৈতজগতের পরস্পর বিরোধী গুণরাশির একত্র সামঞ্জস্যকারিণী, রণরঙ্গিনী হইয়াও ভক্তভয়ভঞ্জিনী; ত্রিদেবজননী হইয়াও শিবহৃদয়-রঞ্জিনী, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়াও নগেন্দ্র-প্রাণ-নন্দিনী, ত্রিলোকপিতামহের প্রসবিত্রী হইয়াও নিত্যনবযৌবনা, ত্রিলোক-

ব্যাপিনী হইয়াও অবাঙ্মনসগোচরা, আবার অবাঙ্মনসগোচরা হইয়াও অনন্তমূর্ত্তিধরা, নির্দ্বন্দ্বা হইয়াও ধর্ম্মের পক্ষপাতিনী, ব্রহ্মাণ্ড-জননী হইয়াও দৈত্যকুলবিধ্বংসিনী, আবার দানবকুলঘাতিনী হইয়াও দানবকুলনিস্তারিণী, সপ্তসমুদ্রচারিণী হইয়াও ক্ষীরসমুদ্রবিহারিণী, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বরী হইয়াও মণিদ্বীপনিবাসিনী, উপাধির অতীতা হইয়াও চিন্তামণিগৃহস্থিতা, ভবনবন-সমানদর্শিনী হইয়াও পারিজাত-বনাশ্রিতা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গফলের চিরকল্পলতা হইয়াও স্বয়ং কল্পতরুতলস্থিতা, ভস্মরত্নে সমদর্শিনী হইয়াও রত্নসিংহাসনগতা, অনন্তজগতের আধারশক্তি হইয়াও সদাশিবমহা-প্রেত-পদ্মাসনশায়িনী, অনন্তকোটী চন্দ্র সূর্য্য বহ্নিমণ্ডলের জ্যোতির্বিধায়িনী হইয়াও স্বয়ং নিবিড়কালকাদম্বিনী, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বপ্রকাশলীলা হইয়াও দলিতাঞ্জনপুঞ্জনীলা, গভীর তিমির-কান্তিধারিণী হইয়াও সচ্চিদানন্দ-লাবণ্যভরে অনন্ত ভক্তভুবনের অন্তরন্ধকারহারিণী, স্বয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণ-বীণাধ্বনি-বিনোদিনী হইয়াও পঞ্চাশন্মুণ্ডমালিনী, প্রপঞ্চের অতীতা হইয়াও ত্রিগুণাকারবিহারিণী, বেশবিন্যাসবিমুখী হইয়াও চন্দ্রখণ্ডবিমণ্ডিতা, কালখণ্ডনতৎপরা হইয়াও কালকৌতুকসুপণ্ডিতা, নিখিলব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হইয়াও মহাশ্মশানবাসিনী, কেবলা নিষ্কলা নিত্যশুদ্ধা হইয়াও অনন্তকোটী যোগিনী-বৃন্দসহচারিণী, ভববন্ধনবিধায়িনী হইয়াও ভক্তবন্ধন-মোচনচ্ছলে নিত্যমুক্ত-কেশী, বামাস্বরূপধারিণী হইয়াও দক্ষিণচরণ-প্রসারণচ্ছলে দক্ষিণাংশ বিজয়িনী, মায়ামোহের অতীতা হইয়াও মদভরঢলঢল—ঘোরঘূর্ণিতরক্তনয়না, করাল মুখমণ্ডলেও মধুর-মন্দস্মিতহাসিনী, খড়্গমুণ্ডধরা হইয়াও বরাভয়বিধায়িনী, লজ্জাবৃত্তিপ্রবর্ত্তিনী হইয়াও নির্লজ্জার শিরোমণি—অনন্ত অম্বরব্যাপিনী হইয়াও দিগম্বরী, সর্ব্বানন্দস্বরূপিণী হইয়াও যোগানন্দ-উন্মাদিনী, অনন্ত চরাচরের প্রসূতী হইয়াও মহাকালবিলাসিনী।

সাধক! এই পরস্পরবিরোধী অনন্তগুণরাশির একাধারে এমন অতুল সজ্জা আর কোথায় দেখিতে পাইবে? যেন অনন্তগুণময়ীর অনন্তগুণ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইয়া অনন্তভুবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাঁহার গুণ তাঁহাকে পাইয়া মাতৃহারা

সন্তানদলের ন্যায় নির্ব্বিরোধে মায়ের কোলে ঘুমাইয়াছে। সাধক ! সগুণমূর্ত্তি-প্রধান উপাসনাকাণ্ডে গুণময়ীর এই গুণেই ত সাধকের মনঃপ্রাণ সংসার হইতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণকল্পতরুর শীতল ছায়ায় অতুলশান্তি সম্ভোগ করে, অনন্তগুণের আধার বলিয়াই ত সে মূর্ত্তি এত মধুর, এত মনোহর ! কোন একটি গুণ যে স্থানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, সেই স্থানেই অন্য গুণের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয় ; করুণা যে স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে, কঠোরতা সে স্থান হইতে অনাদৃত হইয়া পলায়ন করে—গুণ সকল স্বভাবতঃই এইরূপ পরস্পর বিরোধী ; কিন্তু যে স্থানে কোন গুণেরই আধিপত্য নাই, কোন গুণই যেখানে অধীন ভিন্ন অধিপতি নহেন, সেখানে কাহার সহিত কাহার বিরোধ হইবে ? খাদ্য বস্তু লইয়া সন্তানের দলে ততক্ষণই ঘোরতর বিবাদ, যতক্ষণ মা আসিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থান ও খাদ্যপদার্থ বিভক্ত করিয়া না দেন ; তদ্রূপ গুণও ততক্ষণ পর্য্যন্তই পরস্পর বিরোধী হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিগুণাতীতা নিজ নিঃসঙ্গ-অঙ্গে তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত না করেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে সকল গুণই তখন গুণ থাকিয়াও নির্গুণ-স্বরূপে পরিণত হয়, তাই তাঁহার গুণ সকল পরস্পর বিরোধী হয় না. তাই মায়ের শ্রীঅঙ্গে বামে খড়্গমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয় শোভা পায়, তাই মায়ের অট্ট অট্ট হাসির ছলে করুণার বিগলিত ধারা বহিয়া যায়—তাই রণরঙ্গিণীর প্রেমতরঙ্গে ত্রিভুবন ভাসিয়া যায়, তাই আনন্দময়ীর গুণের গুণে, প্রেমের গুণে নির্গুণ সদানন্দ পুরুষ তাঁহার চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছেন। ধন্য গুণময়ীর গুণাতীত গুণলীলা, ধন্য নির্গুণার গুণের খেলা, ধন্য সগুণ সংসারে তাঁহার গুণের মেলা ! ! !

সগুণ সংসারে এ অনন্তনির্গুণ গুণের একত্র সমাধান অসম্ভব বলিয়াই গুণাতীতার গুণলীলাময় মূর্ত্তিপরিগ্রহ। পার্থিব জগতে তিনি প্রত্যেক জীবহৃদয়ের অন্তশ্চারিণী হইলেও এত গুণ একত্র সম্ভবে না, তাই তাঁহার নিত্য সিদ্ধ পরিস্ফুট চৈতন্যাংশ জীবকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রথমে অপরিস্ফুট-

চৈতন্য অনন্ত গুণের প্রতিবিম্ব প্রতিমাতেই তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা। শেষে প্রাণপ্রতিষ্ঠাকালে মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মূর্ত্তিতে ব্রহ্মচৈতন্য সঞ্চারিত হইলেই তখন মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে যে চিন্ময় আবির্ভাব উপস্থিত হইবে, জীবদেহে শত সহস্র উপাসনা করিয়াও সে শক্তি সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি সর্ব্বভূতব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাতেই তাঁহার ব্রহ্মরূপের উপাসনা সুসম্ভব—এই জন্যই ভগবান্ ভূতভাবন বলিয়াছেন—

"গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
এবং সর্ব্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥"

গাভীর দুগ্ধ তাহার সর্ব্বাঙ্গজন্য হইলেও স্তনদ্বার হইতেই যেমন তাহা লাভ করা যায়, তদ্রূপ দেবতা বিশ্বব্যাপিনী হইলেও প্রতিমাতেই তাঁহার স্বরূপ সত্তার উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্বাঙ্গেই দুগ্ধ জন্মে বলিয়া গাভীর না-সিকা পুচ্ছ লাঙ্গুল প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দোহন করিলে তাহা হইতে যেমন শ্লেষ্মা মূত্র গোময়াদি লাভেরই ধ্রুবসম্ভাবনা, সর্ব্বভূতে তিনি অধিষ্ঠিত বলিয়া তোমার আমার এই দেহে জীবরূপে তাঁহার উপাসনা করিলেও তাহা হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের পরিবর্ত্তে তদ্রূপ জীবতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেরই অবশ্যম্ভাবিতা! আর যদি জীবরূপ ব্রহ্মাংশ লইয়া ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করা হয়, তাহা হইলেও জীবদেহে সে সর্ব্বশক্তির স্বরূপ অনুভব অসম্ভব। আবার এই জন্য যদি জীবত্ব উপাধিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ চিৎ-সত্তা মাত্র লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে আর জীব-দেহে প্রয়োজন কি? উপাধি ত্যাগ করিলে ত ব্রহ্ম'ওই তাঁহার সত্তাময়? আবার—সেই নির্গুণ স্বরূপই আসিয়া পড়িল; সে তত্ত্বের যখন অনুভব হইবে, তখন ত আর উপাসনারই প্রয়োজন নাই। তাই সগুণ অবস্থায় থাকিয়া অনন্ত গুণাতীত অথচ অনন্ত-গুণময় ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিতে তাঁহার আজ্ঞাবলে, মন্ত্রবলে, কল্পনায় বা উপমা উদাহরণ দৃষ্টান্তে না হইয়া সত্য সত্য নিত্য প্রত্যক্ষরূপে তাঁহার সে স্বরূপ শক্তি অনুভব করিতে একমাত্র তাঁহার স্বেচ্ছা-পরিগৃহীত লীলাময় মূর্ত্তি ভিন্ন উপাসনাকাণ্ডে আর উপায়ান্তর নাই।

এই জন্যই প্রতিমার এত অতুল মহিমা, এই জন্যই প্রতিমা তাঁহার উপাসনার অবলম্বন স্তম্ভ, এই জন্যই প্রতিমার উপাসক সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-কৈবল্যের অধিকারী। প্রতিমা যেরূপ তাঁহার ব্রহ্মলীলার নিত্যাধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, যন্ত্রও তদ্রূপ নিত্যাধিষ্ঠান ক্ষেত্র; কিন্তু যন্ত্রতত্ত্ব নিতান্তই গুরু-গম্য—সে গুরুগভীর নিগূঢ়-তত্ত্ব সাধারণতঃ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তবে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যন্ত্র কেবল তাঁহার মন্ত্রমূর্ত্তির স্বরূপপ্রকাশ, অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ব্যতীত যন্ত্রতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার নাই—গুরুদেব নিজ শিষ্যের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া সে তত্ত্ব বিবৃত করিবেন। তজ্জন্যই কুলার্ণবে দেবদেব আজ্ঞা করিয়াছেন——

তস্মাদ্ যন্ত্রং লিখিত্বা বা পূজয়েৎ পরমাং শিবাং
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাৎ সর্ব্বং পূজয়েদ্বিধিনাপ্রিয়ে॥ (তন্ত্রতত্ত্ব ৫১৭ পৃষ্ঠা)

এখন, ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিয়াছেন, ভূগোলসূত্র পড়িয়াছেন, এই সূত্রে যাঁহারা আপনাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত বিজ্ঞ বহুদর্শী বলিয়া মনে করেন, যোগবাশিষ্ঠ, পাতঞ্জলসূত্র ও পঞ্চদশীর অনুবাদ পড়িয়াছেন বলিয়া আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধসাধক বলিয়া মনে মনে বিলক্ষণ অভিমান রাখেন, বাঁধগদে অচল ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা হয় ত এখনও বলিবেন যে, " সর্ব্বব্যাপী পদার্থের আবার একটা আবাহন বিসর্জ্জন কি ?" তাঁহাদিগের কথায় কথায় উত্তর করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—তবে এইমাত্র বলি যে, " সর্ব্বত্র তিনি আছেন " ইহা যদি মুখের কথা না হইয়া যথার্থই হৃদয়ের কথা হইত, তাহা হইলে আর আজ তুমি " তুমি আমি, তিনি ইনি, যে সে " সম্বন্ধ ঘটাইয়া আমার কথার উত্তর করিতে আসিতে না ? বলিতে কি ? " তিনি সর্ব্বত্র আছেন " এ কথা ভাই! তোমার খাতায় আছে, কিন্তু মাথায় নাই। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগ এ সকল বিভাগের হেতু কি, ভেদ কি, তাহা তুমি বুঝিতেও

পার না, বুঝিবার শক্তিও নাই, তাই তাঁহার আবাহন বিসর্জ্জনের নাম শুনিলেই স্বপ্ন দেখিয়া দণ্ডে দশবার চিৎকার করিয়া উঠ। হৃদয়স্থ দেবতাকে মন্ত্রবলে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়া বাহিরের পূজা শেষ করিয়া আবার হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে স্থাপন করার নাম আবাহন আর বিসর্জ্জন, এ কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকিত, অলৌকিক দৈবশক্তির আবির্ভাবের নাম সাধনার সিদ্ধি, ইহা যদি তোমার জ-ান্তরীণ সংস্কারেরও অন্তর্নিহিত হইত, তাহা হইলেও তুমি এ কথা কখন মুখে আনিতে পারিতে না যে, "তাঁহার আবার আবাহন আর বিসর্জ্জন কি ?" আজ ফলে ফুলে কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে, সে ত অনেক দূরের কথা, এ অকাণ্ড কাণ্ড সৃষ্টির মূলবীজেই তাহা ছিল কি না সন্দেহ! ইহা আমাদিগের অতিরঞ্জিত কথা নহে, ফুলে যাহা ফুটিয়াছে, ফলে যাহা ঘটিয়াছে—তাহা দেখিয়াই বীজের শক্তি সপ্রমাণ করিয়া লও।—রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন——

"মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার॥

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে, তুমি বা কে আন কাকে, এ কি চমৎকার॥ অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে, ইহতিষ্ঠ বল তাঁরে, এ কি অবিচার॥ এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥"

ইহার উত্তর আর আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে না, সাধনাপ্রাণ মহাত্মা দিগম্বর ভট্টাচার্য্য যাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট——

"ভ্রান্তিতে শান্তি আমার। আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার॥

সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়, বলি বায়ু আয় আয়, জীবন-সঞ্চার॥ জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ি! কর গো নিস্তার॥ জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি, ধ্যান জ্ঞান জল ফল সকলি ত তাঁর॥"

ভ্রান্তি ত ছাড়িবার নহে, ছাড়িলেও তাহা কথায় বা গানে ছাড়িবার নহে, তবে আর ভ্রান্তি ভ্রান্তি করিয়া কাঁদিয়া এ অশান্তি ভোগ করা

কেন ? নিদ্রা ত ভাঙ্গিবার নহে, তবে আর দিন রাত্রি দুঃখ দুর্গতির চিন্তা করিয়া দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখিয়া এ চিৎকারে ফল কি ? বরং দুঃখের পরিবর্ত্তে অভিলসিত সুখের চিন্তা করিয়া নিদ্রার সময়টা সেই সুখের স্বপ্ন উপভোগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাই সংসারতপ্ত জীবনে ভ্রূভঙ্গী করিয়া সাধনতৃপ্ত জীবন দিগম্বর বলিতেছেন—"ভ্রান্তিতে শান্তি আমার। আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।" তোমারও ক্ষতি নাই, আমারও ক্ষতি নাই, যাঁহাকে ডাকি তাঁহার কোন ক্ষতি নাই—তবে জিজ্ঞাসা করি, এ ক্ষতি কার ? তোমার ক্ষতি নাই, কারণ আমি ডাকিতেছি ; আমার ক্ষতি নাই, কেন না আমি ডাকিয়া শান্তি পাইতেছি—আর যাঁহাকে ডাকিতেছি, তাঁহারও কোন ক্ষতি নাই—কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে ত আমি আর তাঁহাকে ডাকিতেছি না—তিনিই আজ আমি হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন—কেবল তুমি আমি দেখিতেছি যে, তুমি আমি ডাকিতেছি—বস্তুতঃ সে ডাকা ত মিথ্যা। তবে বলিতে পার, তিনি এ মিথ্যা ডাক ডাকেন কেন ? আমরা বলি, এ কথার উত্তর জীবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়—তিনি ব্রহ্ম থাকিয়াও জীব হইলেন কেন ? সচ্চিদানন্দ থাকিয়াও দ্বন্দ্বদুঃখ বিজড়িত হইলেন কেন ? এ কথার উত্তর করিবে কে ? লীলানন্দময়ী তিনি, লীলাই তাঁহার আনন্দনাটক, এ সংসারলীলা-নাটকে তিনি যদি জীবরূপে আপনি আপনাকে ডাকিয়া আপন আনন্দে আপনি উন্মত্তা হয়েন, আপন ভ্রান্তিতে স্বপ্ন দেখিয়া তিনি যদি আপন শান্তি আপনি উপভোগ করেন, তাহাতে তাঁহারই বা ক্ষতি কি ? আর সংসারদৃষ্টিতে আমি জীব হইয়া যদি তাঁহাকে ডাকি, তবে তাহাও ত তাঁহারই আজ্ঞানুমোদিত, তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতির কি কথা আছে ? তাই এ সংসার ভ্রান্তি, ইহা জানিয়াও ভ্রান্তিনিদ্রার বিষম স্বপ্নে জাগিয়াও ভ্রান্তির মূলতত্ত্ব বুঝিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রান্তসাধক অভ্রান্ত তান্ত্রিক দিগম্বর শান্তিসাগরে ডুবিয়া বলিতেছেন——ভ্রান্তিতে শান্তি আমার। "যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে, তুমি বা কে ? আন কাকে, একি চমৎকার"

যিনি সর্ব্বত্র আছেন, তাঁর ত আর "এখানে ওখানে" নাই, তবে আর তাঁহাকে "ইহাগচ্ছ" (এখানে এস) বল কি করিয়া? এই স্থানে রায় মহাশয় একটু ডুবিয়া বুঝিলে বোধ হয় আর এরূপ বলিতেন না—কারণ, বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের এখানে ওখানে নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু ইহাগচ্ছের এ "ইহ" ত ব্রহ্মের ইহ নহে, ইহা সাধক বলিতেছেন—তাঁহার নিজের ইহ, ব্রহ্মের এখানে ওখানে না থাকিলেও সাধকের ত তাহা আছে। তিনি বলিতেছেন—"আমার এখানে এস" যদি "তোমার এখানে" বলিতাম, তাহা হইলে একদিন দোষের কথা ছিল — কিন্তু শাস্ত্রোক্ত এই সাধকের "ইহ" বোদ্ধার বুদ্ধিদোষে ব্রহ্মের "ইহ" হইয়া গিয়াছে—দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ধের স্কন্ধে অন্ধ উঠিয়াছেন, তাই তুমি আমিও বুঝিয়াছি যে, এ ইহ ব্রহ্মেরই ইহ!!! ইহার পর যদি আপত্তি করা যায় যে, ব্রহ্মের যখন "এখানে ওখানে" আদৌই নাই, তখন এখানে আসিতে বলিলেই বা তিনি আসিবেন কি করিয়া? আমরা বলি, তবে আর একটু অগ্রসর হইলেই ভাল হয়—যাঁহার "এখানে ওখানে" নাই, তাঁহার ত আসা যাওয়া নাই; তবে আর একেবারে মূল হইতে তাঁহার আসা লইয়া আপত্তি না তুলিয়া "এখানে আসা" লইয়া আপত্তি কেন? যাঁহার আসা নাই, যাওয়াও নাই, তাঁহার খাওয়াও নাই, পরাও নাই, নেওয়াও নাই, দেওয়াও নাই—নাই বলিতে কিছুই নাই—ঐ সঙ্গে তোমার আমার উপাসনাও নাই নাই নাই!!! এইবার সব পরিষ্কার, ইহারই নাম অতিবুদ্ধি। এই স্থানেই রায় মহাশয়ের বুঝা উচিত ছিল যে, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ভিন্ন অধিকারের কথা—উহা কেবল জ্ঞানকাণ্ডেই শোভা পায়, ভক্তিসংস্কৃত জ্ঞানকর্ম্ম—উপাসনাকাণ্ডে উহার অধিকার নাই। এক অধিকারের কথা লইয়া অন্য অধিকারে ব্যঙ্গ করা ভাল হয় নাই—ইহারই নাম "কাণ্ডজ্ঞান না থাকা"!!! আবার বলিতেছেন—"তুমি বা কে? আন কাকে? একি চমৎকার" চমৎকারের কারণ এই যে—তুমি বা কে? আন কাকে? এই "তুমি বা কে? আন কাকে"র গতি তিন দিক হইতে পারে, এক তুমি বা কে?

আন কাকে ? অর্থাৎ তুমিই ত তিনি, কেন না, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, ইহা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা—ঐ কাণ্ডেরই পুনরাবর্ত্তন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই—কারণ ও কাণ্ডের উত্তর আমরা ঐ কাণ্ডেই করিয়াছি। তার পর দ্বিতীয় গতি—"তুমি বা কে, আন কাকে" অর্থাৎ তিনি তোমারই হৃদয়স্থ, তবে আবার আন কাকে ? আমরা বলি, হৃদয়স্থ দেবতা হইতে অন্য একজন দেবতাকে আমরা বাহিরে আনিয়া পূজা করিয়া থাকি, ইহা যদি রায় মহাশয় বুঝিয়া থাকেন, তবে বলিহারি তাঁহার বাহ্য পূজার অভিজ্ঞতায়। যে তত্ত্ব তিনি জানেন নাই বা বুঝেন নাই তাহা লইয়া উপহাস বা আন্দোলন করাও তাঁহার ভাল হয় নাই——

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবমুপাসতে
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ভূতিভারং সমৃচ্ছতি ॥

হৃদয়স্থ দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বাহিরের দেবতার উপাসনা করে, করস্থিত মণিকে ত্যাগ করিয়া সে ভস্মরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়—(কারণ বাহ্যমূর্ত্তিতে হৃদয়স্থ দেবতার তেজঃ সংক্রামিত না হইলে তাহা দেবতার পূজা না হইয়া কেবল প্রতিমারই পূজা হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, করস্থ মণি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়।) এই শাস্ত্রবাক্য যে উপাসনার মূলভিত্তি, তাহাতে হৃদয়স্থ দেবতা ত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ দেবতার পূজা করা হয়, ইহা যদি রায় মহাশয় বুঝিয়া থাকেন, তবে তাহাও তাঁহার ভ্রান্তি বিজৃম্ভন মাত্র। আর, তুমি বা কে ? আন কাকে ? অর্থাৎ তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, তিনি মহান্ অপেক্ষাও মহান্, অসীম অনন্ত—তাঁহাকে তুমি আনিবে কি করিয়া ? আমরা বলি, ইহার জন্য আমাদিগের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই——কারণ আমরা কোন মনঃকল্পিত বিধানে তাঁহার উপাসনা করিতে যাই না, শাস্ত্র তাঁহারই আজ্ঞা, তিনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা তদনুসারে চলিব। আনিতে কেন পারিব, তাহা তিনি ভাবিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা

ভাবিয়াই তিনি মন্ত্রশক্তিরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই তিনি তদনুসারে স্বয়ং তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন!!! অসীম অনন্তরূপে উপাসনা হয় না বলিয়াই তিনি জীবের প্রতি করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া কখন ছোট, কখন বড়, অসীম হইলেও সসীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সে অর্থেও "তুমি বা কে? আন কাকে, একি—চমৎকার?— এ চমৎকারও আমাদের চমৎকার বলিয়াই বোধ হয়। এখন দ্বিতীয় কথা এই হইতে পারে যে——ব্রহ্মের "এখানে ওখানে" না থাকিলেও সাধকের তাহা আছে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যাঁহাকে যেখানে ডাকিব, তিনি যখন না ডাকিতেও সেখানে আছেন, ইহা স্থির, তখন নিরর্থক এ ডাকা কেন? এই আপত্তি লক্ষ্য করিয়াই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের যোজনা দ্বারা তত্ত্বদর্শী সাধক, সত্য সত্য তাঁহার আবাহন এবং আবির্ভাব প্রতিপন্ন করিতেছেন —" সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়, বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।" স্থূল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে বায়ু পদার্থ সর্ব্বব্যাপী, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ; কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের যাতনায় প্রাণ যখন যায় যায় করে, তখন সেই কাতর প্রাণে হৃদয়ের সহিত কে না বলে— বায়ু আয় আয়! কেন? বায়ু আসিবেন কোথা হইতে? বায়ু ত আছেনই সর্ব্বত্র, বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে, কোথাও কি জীবের অস্তিত্ব থাকিত? অন্তরে বাহিরে বায়ু আছেন বলিয়াই জীবের প্রাণ রহিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে; তবে আর "বায়ু আয় আয়" এ আবাহন কেন? আছে—আবাহনের কারণ বায়ুতে কিছু না থাকিলেও আমাতে বিলক্ষণ আছে—নিদারুণ গ্রীষ্মের যাতনায় আমার দেহ মনঃ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাই বায়ুকে আবাহন করিতে আমার মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে; এ সময়ে সর্ব্বত্র বায়ু থাকিলেও আমার পক্ষে তাঁহার থাকা না থাকা দুইই সমান হইয়া উঠিয়াছে। আমি যে বায়ুকে ডাকিতেছি, তিনি ত নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইবার জন্য নহেন, তাঁহাকে ডাকিতেছি, আমার অন্তরের বাহিরের অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য; সে কার্য্য ত

এ নির্ব্বিশেষ সূক্ষ্ম বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে, তাহার জন্য সেই মলয়াচলবক্ষ-বিহারী চন্দনবন-সৌগন্ধহারী বিশ্বতাপশান্তিকারী গ্রীষ্মদমন পবনরাজের প্রয়োজন; তাই সর্ব্বত্র সূক্ষ্মবায়ু প্রবাহিত থাকিলেও আমি তখন তাহা উপেক্ষা করিয়া স্থূলবায়ুকে ডাকিতে গিয়া বলি "বায়ু! আয় আয় জীবন সঞ্চার" আর ইহা কেবল আমার বলা নহে, বস্তুতঃও যতক্ষণ সেই স্বন্ স্বন্ বেগে প্রবাহিত পীযূষস্পর্শময় শীতল-স্নিগ্ধতরঙ্গ সমীরণসঙ্গে এ অঙ্গ না সন্তর্পিত হইবে, ততক্ষণ এ নিখিল বিশালব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল খুঁজিয়া কোথায়ও আমার সে শান্তি সম্ভাবনা নাই; তদ্রূপ তাঁহাকে আবাহন করিবার কারণ তাঁহাতে না থাকিলেও আমাতে বিলক্ষণ আছে- —আমি ত্রিতাপতপ্ত দগ্ধজীব, ঘোর সংসারযাতনায় আমার মনঃ প্রাণ নিরন্তর জর্জরিত, বিষময় বিষয়ের বিষম জ্বালায় আমি দিন রাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি, এ সময়ে সর্ব্বত্র তিনি থাকলেও ত আমার জ্বালা ঘুচিতেছে না—তাই নির্ব্বিশেষ-সত্তারূপে তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত থাকিলেও আমার পক্ষে তাঁহার এ থাকা না থাকা দুইই যেন সমান হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার সত্তামাত্র চিৎস্বরূপ অবগত হইয়াও তাঁহাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইতে পারিতেছি না। —আমি চাই তাঁহাকে, যাঁহাকে পাইলে আমার সকল জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে; সংসারের ঘোর দাবানলে একেবারে বেষ্টিত হইয়াছি, আর পালাইবার পথ নাই —এখন এই অগ্নিমণ্ডলের প্রচণ্ড জ্বালামালায় চতুর্দ্দিক্ হইতে দগ্ধ হইয়া হতাশহৃদয়ে ঊর্দ্ধবাহু প্রসারণ করিয়া মর্ম্মভেদি-গভীরকাতরকণ্ঠে যেমন ডাকিয়া বলিব —"জগদম্বে! কোথায় আছিস্ মা! আমি মলেম মলেম, করুণাময়ি! রক্ষা কর্, আয় মা! আয় মা! আয় মা! মা আমার" এই মুখের কথা মুখে থাকিতে সন্তানের ব্যথায় ব্যথিত-হৃদয়ে ত্রস্তব্যস্ত-বিগলিতবেশে কৈলাসের স্বর্ণসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দশদিগন্তে দশ অভয়ভুজ প্রসারণ করিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভৈরবমনোমোহিনী মা যদি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, তবেই আমার পাপ তাপ রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা জন্মের মত মিটিয়া যাইবে — নতুবা

সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত তাঁহার শত সহস্র সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইলেও এ করুণাময় স্থূলতত্ত্ব ব্যতীত আমার দুর্গতি ঘুচিবার নহে — তাই দিগম্বর বলিতেছেন——"জগন্মাতা জগন্ময়ী, যখন কাতর হই, বলি এস ব্রহ্মময়ি! কর গো নিস্তার।" জগন্মাতা যে জগন্ময়ী, তাহা তুমিও যেমন জান, আমিও তেমনি জানি, কিন্তু অনুভব না হইলে কেবল জানাতেত যাতনা ঘুচিবে না—তাই আমরা যখন কাতর হই——বলি "এস ব্রহ্মময়ি!" এস বলিয়া আবাহন করি বটে, কিন্তু সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত যে বিভূতি তাহা আবাহন না করিয়া, সর্ব্বভূতের অধীশ্বরী যিনি তাঁহাকেই আবাহন করি॥ রায় মহাশয় বলিতেছেন——"একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার।" যাঁহার যাহা নাই, তিনি তাহা পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন, কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্য, তাঁহাকে তুমি বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া স্তব কর, ইহা বড়ই অসম্ভব। তাঁহার বিশ্বের নৈবেদ্য ত তোমার নহে, তবে তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দান করিবার তুমি কে? দান করিতে হইলেই সে বস্তুতে তোমার নিজের স্বত্ব স্থাপন করিতে হইবে——তাঁহার বস্তুতে তুমি নিজের স্বত্ব স্থাপন করিতে গেলেই প্রকারান্তরে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয়। এখন দান করিতে গিয়া লাভের মধ্যে তাহার ফল হইল চৌরদণ্ড ভোগ করা। ইহারই উত্তরে দিগম্বর বলিতেছেন——"জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধন করি. ধ্যান জ্ঞান জল কল সকলিত তাঁর" তাঁহার বস্তুতে আত্মস্বত্ব স্বীকার করিলে যদি চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তবে সে দণ্ড ত তোমার আমার পক্ষে অখণ্ডনীয়; কেবল পূজার নৈবেদ্যের সময় তাহা মনে না করিয়া "আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সম্পত্তি, আমার সংসার" এ সকল কথা বলিবার সময়েও একবার তাহা মনে করা উচিত ছিল; স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার, ইহার মধ্যে "আমার" বলিতে তোমার কি আছে? তুমি যদি নিজের ভোগের সময়ে তাঁহার এই সমস্ত বস্তু লইয়া নিজের বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতে পার—তবে, আমি না হয়, তাঁহার

ভোগের জন্য তাঁহার বস্তুকে একবার আমার বলিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? চৌর্য্যাপরাধের দণ্ড তোমারও যাহা হইবে, আমারও তাহাই হইবে; অধিকন্তু নিজে ভোগ করিয়াছ বলিয়া তোমার যাহা হইবে, তাঁহাকে ভোগ দিয়া আমি প্রসাদ পাইয়াছি বলিয়া আমার দণ্ড তদপেক্ষা অন্যরূপ হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; তাই দিগম্বর বলিতেছেন —" জড়জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি" জড় এবং জীব এই উভয়কে একত্র করিয়া যাঁহার সাধনা করি, ধ্যান ই বল, জ্ঞান ই বল, জপই বল, ফল ই বল এ সমস্ত ই তাঁহার—তোমার দেহ, ইন্দ্রিয় মনঃ, প্রাণ, ধ্যান, জ্ঞান, গান, এ সমস্ত ই ত তাঁহার। তাঁহার নৈবেদ্য দিয়া যদি তাঁহাকে পূজা করা না হয়, তবে তাঁহার মন দিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়া, তাঁহার স্বর দিয়া তাঁহার গান গাইয়া ই বা তাঁহার উপাসনা হয় কি করিয়া? তাঁহার দ্রব্য তাঁ-হাকে দিতে গেলে তুমি আমাকে চোর বল--কিন্তু যাঁহার বস্তু তিনি বলিয়াছেন —" তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।" সেই দেবগণকর্ত্তৃক দত্ত হিরণ্য পশু শস্য প্রভৃতি বস্তু সকল দেবতাকে নিবেদন না করিয়া যদি স্বয়ং ভোগ করে—তবে সেই চোর। এখন বল দেখি ভাই! আমিই দিয়া চোর, কি, তুমি ই না দিয়া চোর? এ বিশ্ব তাঁহার, তাহা সত্য, কিন্তু আমি তাহা বুঝিয়াছি কৈ? যদি "তাঁহার" ই বুঝিতাম, তবে কি আর এ "আমার" ই থাকিত? মুখে "তাঁহার" বুঝিতে অনেকেই সুপটু, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করাই সুকঠিন। যে দিন "তাঁহার" বলিয়া সত্য সত্যই বুঝিব, সে দিন "আ-মার" ও ঘুচিয়া যাইবে, পূজাও সাঙ্গ হইবে—কিন্তু যত দিন তাহা না বুঝিতেছি, তত দিন "আমার" বলিয়া তাঁহার এ পূজায় তুমি ব্যঙ্গ কর কোন্ মুখে? তাই বলি, ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া এ শান্তিময় ভ্রান্তিকে "ভ্রান্তি" বলাই ভ্রান্তি—তাই অভ্রান্ত দিগম্বর বলিয়াছেন — "ভ্রান্তিতে শান্তি আমার—আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার" সঙ্গীত-

সাধক মহাত্মা দাশরথি রায়ও তাঁহার আগমনীতে এই তত্ত্বেরই অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন ——

শুভযাত্রায় শুভ ফল প্রাপ্ত হন গিরি।
শুভ দিনে শুভক্ষণে এলেন শঙ্করী॥
ত্বরায় গিরি করে শুভ মঙ্গল-আচরণ।
শুভ সপ্তমীতে শুভ পূজার আয়োজন॥
তন্ত্রধারক মন্ত্র পাঠ করেন পুস্তক ধরি।
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মময়ীর পূজা করেন গিরি॥
যত্ন করি আসনে বসেন মনশুদ্ধে।
স্থানে স্থানে চণ্ডীপাঠ চণ্ডীর সান্নিধ্যে॥
তনয়া চণ্ডীর ধ্যান করি তদন্তরে।
শিরে পুষ্প দিয়া পূজেন মানসোপচারে॥
মানসে হেরিয়া গিরির মানস চঞ্চল।
দেখেন, অনন্তব্রহ্মাণ্ড আমার উমারি সকল॥
মেয়ের, উদরস্থ সমস্ত, মেয়ে ত মেয়ে নয়।
তনয়ার তনয়া তনয় জগন্ময়॥
কোটি ব্রহ্মা কোটি বিষ্ণু কোটী শূলপাণি।
চরণে আশ্রিত, সর্ব্বেশ্বরী শিবরাণী॥
ধ্যান ত্যজে গিরি বলে, চক্ষে শতধার।
আমি, কি দিয়ে পূজিব চণ্ডি! চরণ তোমার॥
আমি ত এ আধিপত্যের অধিপতি নই।
কার দ্রব্য কারে তবে দিব? ব্রহ্মময়ি!॥
ভ্রান্ত হয়ে "আমার আমার" লোকে করে।
ভ্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে?॥
মহামায়া! কি মায়া দিয়াছ আমায় তুমি।
মম দ্রব্য গ্রহণ কর, তোমায় বল্‌ছি আমি॥

সঙ্গীত।

উমা! কি ধন আছে আমার তোমায় দিতে পারি। দেখ্‌লাম, নয়নমুদে, ব্রহ্মাণ্ডময় সকলি তোমারি॥

কি দিব তোয় রত্নবাস, রত্নাকর তব দাস, স্বর্ণকাশী মাঝে বাস, অন্নপূর্ণেশ্বরি! কুবের ভাণ্ডারী ঘরে, কে বলে ভিখারী হরে, তোমার ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে, ত্রিজগৎ ভিখারী॥

প্রসন্না প্রসন্নময়ী কন পিতা প্রতি। সঙ্কল্পিত পূজা সাঙ্গ করহ সম্প্রতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে সকলি আমার। দিয়াছি তোমারে যে ধন তব অধিকার॥
চণ্ডীর কৃপায় চণ্ডী-পায় পূজে গিরি। সপ্তমীর দিবা সাঙ্গ, হইল শর্ব্বরী॥

আ মরি মরি! ইহারই নাম ভক্তহৃদয়ে দেবীর দৈববাণী! "সঙ্কল্পিত পূজা সাঙ্গ করহ সম্প্রতি" ব্রহ্মাণ্ডময় সকলি আমার, ইহা যখন বুঝিয়াছ, তখনই ত মানসপূজা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন "আমার" এই সঙ্কল্পে যে বাহ্য-পূজা সঙ্কল্পিত করিয়াছ; তাহা সাঙ্গ কর। —যদি বল—বাহ্যপূজায় যাহা অর্পণ করিব, তাহাও ত তোমারই, সর্ব্বান্তর্যামিনী মা, তাহারই উত্তর করি-তেছেন—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে সকলি আমার। দিয়াছি তোমারে যে ধন, তব অধিকার" মায়ের মুখে না হইলে আর প্রাণভরা সরল কথায় এমন সরল উত্তর কোথায় পাইব? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলি আমার হইলেও তোমায় যে ধন দিয়াছি, অর্থাৎ যে ধনে তোমার এই "আমার" বুদ্ধি দিয়াছি, তাহা ত তোমারই; কেন না, তোমার এই "আমার" বুদ্ধিও আমিই দিয়াছি—বস্তুস্বত্ব আমার থাকিলেও ভোগের স্বত্ব তোমার, তুমি আজ সেই স্বত্ব আমায় অর্পণ কর, তাহা হইলেই তোমার পূজা সাঙ্গ হইল—আমার ভার আমায় দিয়া পিতঃ! তুমি নিশ্চিন্ত হও—তোমার আজ সকল ভারে মুক্ত করিয়া আমি আমার করিয়া লই—" গিরিরাজ! সকলি তাঁহার, ইহা যাহারা মুখে না দেখিয়া চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাদের পূজা

এইরূপেই সাঙ্গ হয়। ধন্য পূজক তুমি এ সংসারে! মায়ের পূজা যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে তুমিই তাহার অগ্রগণ্য, তুমি বলিয়াছ—"ভ্রান্ত হয়ে আমার আমার লোকে করে, ভ্রান্ত না হইয়া কেবা গৃহাশ্রম করে" কিন্তু তোমার মত অভ্রান্ত গৃহাশ্রমী এ জগতে কে আছে তাহা জানি না, তুমি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ভ্রান্ত বাহ্যপূজায় যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ—কোটি কোটি যোগীন্দ্র পুরুষ অভ্রান্ত অন্তর্যাগেও তাহা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ! বাহ্য পূজা ত এ জগতে সকলেই করে, কিন্তু অন্তরের ধন বাহিরে আসিয়া তোমার মত কাহাকে কবে এমন করিয়া সান্ত্বনা করেন? জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্ম-ময়ী আনন্দময়ী মা আমার, অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াও তোমার বাহ্য-পূজা লইবার জন্য এক বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিধাম কৈলাসের মণিমন্দিরে উৎকট উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়া সাধকের সাধনা সাধিতে সাধে সাধে সাদরে এমন করিয়া কবে কাহার মন্দিরে আসিয়া থাকেন? এ ব্রহ্মাণ্ডে কে এমন সৌভাগ্যশালী যে, পূজার প্রারম্ভেই অন্তরের জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মময়ীকে মূর্ত্তিময়ী করিয়া সম্মুখে রাখিতে পারে? কাহার এমন সৌভাগ্য যে, সাধনার সাধ্য ধন সাধ করিয়া বাহিরের পূজা গ্রহণ করেন? গৌরবের "গৌরীগুরু" নাম ধরিয়াও গৌরীপূজায় তুমিই এ জগতের দীক্ষাগুরু, তোমার প্রদত্ত গৌরীপূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই আজ এ চরাচর সংসার দুর্গোৎ-সবের অধিকারী, তাই তোমার দুর্গ-সাধনার লব্ধনিধি দুর্গাধন জগতের মা হইয়াও তোমার মেয়ে! কাহার সাধ্য মাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিতে পারে! কিন্তু ভক্তরাজ গিরিরাজ! সিদ্ধেশ্বরীর সাধের পিতা সিদ্ধরাজ! আজ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, আর তোমাকে মাতামহ পাইয়া জগদ্বাসী আ-মরাও ধন্য; তাই বলি প্রভো! তোমার এ ধন্যবাদ না বুঝিয়া জগতে যাহারা অধন্য, তাহাদিগের সেই মরুময় হৃদয়ে একবার তোমার ঐ — ধূর্জ্জটি-মোহিনী নন্দিনীর প্রেমের নির্ঝর ঢালিয়া দাও, মধুর—মা-রবের উত্তাল তরঙ্গমালা তাহাদিগের উত্তপ্তপাষাণপ্রাণ শীতল করিয়া ধরাধরের কল্যাণে আজ ধরাতলে আনন্দের অনন্তস্রোতঃ প্রবাহিত করুক্।

পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিবাদ বা মায়াবাদকে লক্ষ্য করিয়াই রায় মহাশয় গীতান্তরে বলিয়াছেন——

" তুমি কার ? কে তোমার ? কারে বল রে আপন,
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে, যায় নানা স্থান।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব
সময়ে পালাবে তারা, কে করে বারণ॥
কোথা কুসুম চন্দন মণিময় আভরণ
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণপ্রিয়জন—
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।"

বিষয়সংসারে মায়ানিদ্রার বিকট স্বপ্নের ভ্রান্তিবিভীষিকা দেখিয়া বা দেখাইয়া রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য সত্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ; কিন্তু সাধনসংসারে আবার সেই মা-ময় মায়ানিদ্রার মধুর শান্তি স্বপ্ন দেখিয়া মহাত্মা দিগম্বর যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে যেন সেই ভ্রান্তিময় সংসারই অনন্ত শান্তির আধার বলিয়া বোধ হয়—দিগম্বর উত্তর দিয়াছেন——

" মা আমার, আমি মার, তাঁরে বলি রে আপন,
মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন ?
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে,
আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন-

যাতায়াতে সমাচার, নিত্য সত্য এ সংসার,
চিন্ময়ীচরণ-চিন্তা—সংসারবন্ধন ॥

মহাশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া ভক্তের অটল হৃদয়ে কি অতুল বলই ছুটিয়াছে। বেদান্তদর্শনের অমোঘ অস্ত্রবলে যেমন জিজ্ঞাসা হইয়াছে "তুমি কার ? কে তোমার ?" অমনি যেন মুখের কথা মুখে থাকিতে সদর্পে বক্ষঃস্ফীত করিয়া ভুবনবিজয়ী ভক্ত বলিতেছেন ——" আমি মার, মা আমার"। " কারে বলরে আপন ?"—" তাঁরে বলি রে আপন।" "মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।" " মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন " যাঁর মায়ার স্বপ্ন দেখিয়া তুমি ভয়ে বিহ্বল হও ——আমি সেই মায়ার অধীশ্বরী সাক্ষাৎ মহামায়া মাকেই স্বপ্নে দেখি, মহামায়া মা যাকে দেখা দেন, মায়া দেখিয়া তাহার কিসের ভয় ? " প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন " ইহা তোমারও যেমন, আমারও তেমনই, তবে—তুমি এই বলিতেছ যে, বিষয় সংসারেই হউক, আর সাধন-সংসারেই হউক, মায়াময় সংসারে যাহা দেখা যায়, তাহাই স্বপ্ন—(রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন) ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তুমি অদ্বৈতবাদী, দ্বৈত বলিতে কিছুই মান না—— সুতরাং উপাস্য উপাসক লইয়া যখন সাধন কাণ্ড, তখন তাহাও যে মান না ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ; সাধনা যখন মান না, জান না, কর না—তখন এ মায়া, এ নিদ্রা, এ স্বপ্ন, বুঝাইলেও তুমি বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং সে সম্বন্ধে তোমার সহিত বাঙ নিষ্পত্তি নিষ্প্রয়োজন, অথবা তুমি যাহা বলিয়াছ, সাধন-সংসার তাহার লক্ষ্য নহে, বিষয়-সংসারই লক্ষ্য, সুতরাং সে সম্বন্ধেও বলিবার কিছু নাই। এখন—(রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন ; প্রপঞ্চ-জগৎ মিথ্যা)—— ই[illegible]ও সত্য, কিন্তু এ মিথ্যা কখন্ হয়, কাহার হয় এবং কাহার মুখে শোভা পায়, কাহার কর্ণে স্থান পায়—তাহাই একবার বুঝিবার কথা, তাই দিগম্বর বলিতেছেন ——স্বীকার করিলাম, রজ্জুতে অহি-দর্শন ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, সুতরাং মিথ্যা, কিন্তু " রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন, অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন ?" স্বপ্নে যখন ব্যাঘ্র

দেখিয়া ভয় হয়, তখন সেই স্বপ্নাবস্থায় কি ব্যাঘ্রকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়? যদি তাহাই হইত, তবে কি আর স্বপ্নে ব্যাঘ্র দেখিয়া কেহ ভয় পাইত? স্বপ্নের ব্যাঘ্র মিথ্যা হয়, সত্য, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর; তদ্রূপ ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে সর্পদর্শন হয়; সুতরাং সে সর্প মিথ্যা ইহা সত্য, কিন্তু সে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ভ্রান্তি ভঙ্গের পর——তবেই মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইয়া সংসার-স্বপ্ন দেখিতেছ, এই অবস্থায় তুমি সংসারকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিবে কিরূপে? এই অনুভব হয় না বলিয়াই সাংসারিক জীবের কর্ণে মায়াবাদের উপদেশ স্থান পায় না। দ্বিতীয় কথা, মায়া থাকিলেই কাহার মায়া? মায়ার মধ্যে থাকিয়াও যদি আমি, যাঁহার মায়া তাঁহাকে পাই, তবে ত মায়া মিথ্যাময় হইলেও আমার পক্ষে তাহার ফল সত্যময় হইয়া উঠিল। —যেমন স্বপ্নের মধ্যেও লোকে সত্য ঔষধ পায়, স্বপ্নের মিথ্যা আমোদে বিহ্বল হইয়াও সত্য হাসি হাসিয়া উঠে, স্বপ্নের মিথ্যা বিপদের বিভীষিকা দেখিয়াও সত্য সত্যই রোদন করে, স্বপ্নের মিথ্যা বিতর্ক স্থলে উপস্থিত হইয়াও সত্য সত্যই বিচার করে; তদ্রূপ মায়ানিদ্রার সংসার-স্বপ্নে সাধনার রাজ্যে গিয়া আমি যদি সত্য সত্যই সত্যময়ী মাকে পাই, তবে এ মায়া হইতে আমার সুখের স্বপ্ন শান্তির স্বপ্ন আর কি আছে? লোকের যেমন স্বপ্নের মধ্যে ঔষধ পাইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আমারও যদি তেম্নি মায়ার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভবরোগের মহৌষধ পাইয়া এ সংসার-ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবেই ত আমি কৃতার্থ হইব, সংসারের দ্বৈতজ্ঞানে তিনি মা, আমি পুত্র, তিনি প্রভু, আমি দাস, এই তত্ত্বে তাঁহার সাধনা করিতে করিতে যদি আমি তাঁহার প্রসাদ পাইয়া যাই, তাহা হইলেইত তখন আমি অজর অমর অবিনশ্বর চিৎস্বরূপে দ্বৈততরঙ্গে সাঁতার দিয়া অদ্বৈতসাগরের বক্ষে আনন্দে ভাসিতে পারিব, মুক্তির অগাধ জলে না ডুবিয়া ভক্তির স্রোতে ছুটিতে পারিব, মুক্তির সাগরে সাঁতার দিয়া মুক্তকেশীর চরণকূলে স্থান পাইব; তখন জাগিয়া দেখিব, স্বপ্নেই সাঁতার দিয়া সত্য সত্যই কুলকুণ্ডলিনীর কূলে আসিয়া

উঠিয়াছি, ভবরোগের মহৌষধ পাইয়া সত্য সত্যই ভবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাই দিগম্বর বলিতেছেন, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছ, সেই ভাল, আর জাগিও না ; জাগিয়া জাগিলে সে জাগায় সুখও ছিল, শান্তিও ছিল—আর না জাগিয়া এ জাগিবার নাটক, এও একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে—জাগিয়া জাগিলে তাঁহার হয় শান্তি সুখ, আর না জাগিয়া জাগিলে তাহার সুখশান্তি দূরে থাক্, অধিকন্তু এই " হা হতোস্মি " অশান্তি আর্ত্তনাদ !!!

পাখী সকল একেবারে চলিয়া গেলে ত বৃক্ষ এক দিনেই শূন্য হইত, জীব সকল একেবারে চলিয়া গেলেও সংসার এক যুগেই অনিত্য হইত, কিন্তু পাখী যেমন প্রভাতে গিয়া সন্ধ্যার সময় আবার ঘুরিয়া আসে, জীবও তেমনি মৃত্যুকালে চলিয়া গিয়া জন্মের সময় আবার ফিরিয়া আসে, তাই, যাহাকে তুমি সংসারের অনিত্যতা বল, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সংসারের নিত্যতার নিত্য স্রোতঃ, অধিকন্তু ইহলোকে পরলোকে নিরন্তর যাতায়াতে সংসার যে নিত্য সত্য, এই সমাচারই নিত্য আসে—তাই অনিত্য হইয়াও সংসার নিত্য "নিত্য", তাই আমার সে নিত্য সংসারের নিত্য বন্ধন-শৃঙ্খল কেবল চিন্ময়ীর চরণ চিন্তা——পাছে অদ্বৈতবাদে গিয়া মায়ে পোয়ে এক হইয়া যাই—এই ভয়েই নিত্য সংসারকে নিত্য নিত্য প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, মুক্তির কুহকে পড়িয়া পাছে মা মুক্তকেশীর চরণছাড়া হই—এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কাতেই এ সংসার ছাড়িতে পারি না, মায়ের মুখে মধুর হাসি না দেখিয়া, দণ্ডে দশবার 'মা গো মা, ও গো মা, মা আমার, উমা শ্যামা, মা ওমা " না বলিয়া কেমন ক'রে মুক্তির পরে মা না পাইয়া থাকিব ? তাই বলি, মায়ের প্রেমনিগড়ে এ বন্ধন অপেক্ষা মুক্তিও আমার সুখের নহে, তাই দিগম্বর সাধে সাদরে বলিয়াছেন ——" চিন্ময়ী চরণ-চিন্তা সংসারবন্ধন।" শেষ অন্তরাতে যাহা আছে, দিগম্বরের দিগম্বর-সংসারে তাহা ছিলও না, তিনি তাহার উত্তরও করেন নাই। আবার রায়জী বলিয়াছেন ---

" মন ! তোরে কে ভুলালে হায়। কল্পনারে সত্য করি জান এ কি দায়।

প্রাণদান দেহ তাকে, যে তোমার বশে থাকে, জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়। কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার, প্রভু বলি মান যাঁরে, সম্মুখে নাচাও তাঁরে, এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায়॥"

দিগম্বর উত্তর দিয়াছেন—"ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী। কল্পনারে সত্য করি দেখা দিলা জননী। কল্পনায় অধিষ্ঠান, কল্পনায় দেহ প্রাণ, সত্য করি আত্মদান, এইমাত্র জানি। কখন ভূষণ দেই কখন অশন, কখন স্থাপন করি কভু বিসর্জ্জন, মাতৃরূপা দেখি চক্ষে, নাচিছে বাপের বক্ষে, ভয়ে বলি সর্ব্ব রক্ষে, কর সর্ব্বরূপিণি।॥"

সাধক দেখিবেন—কি বিষম পার্থক্য! রায়জী বলিতেছেন—"মন তোরে কে ভুলাল হায়," দিগম্বর বলিতেছেন—একা মনকে কেন? "ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী।" ত্রিভুবন যাঁহার মায়ায় ভুলিয়াছে, তুমি কি মনে করিয়াছ, তুমি তাঁহার মায়ায় ভুলিবে না? অথবা প্রতিমাপূজায় তুমি যাহা ভুল মনে করিয়াছ, তোমার সংসার-পূজাতেও সেই ভুল। সংসারপূজা ভুল হইলেও তাহাকে যখন সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তখন প্রতিমাপূজাকে সত্য বলিয়া বুঝিবে না কেন? মিথ্যা হইলেও যখন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির সঙ্গলাভে লালায়িত হও, তখন তাঁহার সঙ্গলাভকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে না করিবে কেন? তার পর, আমার কল্পনাকে যদি আমি সত্য বলিয়া জানিতাম, তাহা হইলেও তুমি এক দিন আমার ভুল বলিতে পারিতে—কিন্তু এত তাহাও নহে, যাঁহার এই জগৎকল্পনা, এ যে তাঁহারই কল্পনা! তিনি স্ত্রী পুত্র কল্পনা করিয়াছেন, তাহা যখন ভুলিতে পারিলাম না, তখন তাঁহার স্বরূপের কল্পনা ভুলিব কি করিয়া? তাই—তুমি বল—"কল্পনাকে সত্য করি জান একি দায়" আমরা বলি—সত্যকে কল্পনা করি ভাব এ কি হায়! এ কল্পনার কথা সংসারে না বলিয়া কেবল সাধনার অধিকারে বলা বড়ই আত্মবিস্মৃতির পরিচয়। তবে বলিতে পার—"সংসার কল্পনা হইলেও পিতা মাতাকে

যে পরিমাণে সত্য দেখি, প্রতিমাকে ত তাহাও দেখি না "। আমি বলি, তুমি দেখ না তাহাতে কাহার কি? পেচক দেখে না বলিয়া সূর্য্যের তাহাতে কি আসে যায়? আর যদি নিজে ইচ্ছা করিলেই দেখা যাইত—তাহা হইলেও তোমার এ " দেখি না " কোন দিন সম্ভব হইত——! এ যে—যাহাকে দেখিব, সে দেখা দিলে তবে দেখিবার কথা——তাই আমি সত্য করিয়া কিছু দেখিতে চাই না; কিন্তু সে যে আপন কল্পনাকে সত্য করিয়া আপনি আসিয়া দেখা দেয়——তাহার তুমি কি করিবে? এত বড় মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ডটার কল্পনা যে সত্য করিতে পারে, সে আপনি সত্যস্বরূপিণী হইয়া আপন সত্য, সত্য করিবে, ইহা যদি তোমার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে কি আর বলিব——বলিহারি তোমার—সত্যজ্ঞানে!! তাঁহার মুর্ত্তিও যেমন কল্পনা, অধিষ্ঠানও তেমনি কল্পনা, প্রাণদানও যেমন কল্পনা, প্রাণও তেমনি কল্পনা, সংসারও যেমন কল্পনা, তুমি আমিও তেমনি কল্পনা — শেষ কথা তাঁহার কল্পনাও কল্পনা, তোমার আমার কেবল বৃথা জল্পনামাত্রই সার। তোমার আমার এই মূর্ত্তি কল্পনা তাঁহার যত দিন সত্য রহিয়াছে—তত দিন তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার কল্পিত হইলেও, তাহা সত্য সত্য সত্য!! যে দিন তোমার তুমিত্ব, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে, সে দিন তাঁহার তিনিত্বও অন্তর্হিত হইবে। আজ তাঁহাকে কল্পনা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে তুমি কল্পনা বলিয়া বুঝিলেই ভাল হয়॥ তাই—প্রভু বলি মানি যাঁরে, সম্মুখে নাচাই তাঁরে—এ নাচনা আমি নাচাই না——মাতৃরূপা দেখি চক্ষে, (সে যে আপনি) নাচিছে বাপের বক্ষে, (তাই) ভয়ে বলি সর্ব্ব রক্ষে কর সর্ব্বরূপিণি! সর্ব্বরূপিণীর কোন রূপই যখন ভুলিলাম না, তখন এমন পাপ কি করিয়াছি যে, এ স্বরূপ রূপ ভুলিব? তাঁহাকে হারাইয়া যাহারা তাঁহার রূপ দেখিতে যায়, তাহাদিগের নিকটে তাঁহার রূপ চিরকালই কল্পনা, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাঁহারা তাঁহার রূপ দেখিতে যান, তাঁহারা চিরকালই বলিয়া থাকেন——" কল্পনায়ে সত্য করি দেখা দিলা জননী "॥

অন্য গানে রায় মহাশয় বলিয়াছেন——

"মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা। নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা" দিগম্বরের বরপুত্র দিগম্বর অমনি তাহার উত্তর দিয়াছেন "কেন ক্ষেপা! কর তবে তাঁহার সাধনা? নির্গুণ যদি তিনি রহিত কল্পনা।" মধ্যের এক অন্তরাতে দিগম্বর যাহা উত্তর দিয়াছেন, সে অংশ প্রকাশ হয় নাই। প্রথমে যে " সদা কর তাঁহার সাধনা এ সাধনাও শাস্ত্রোক্ত নহে, ইহা রায় মহাশয়ের নিজের সাধনা; কারণ মধ্যের অন্তরাতে তিনি বলিয়াছেন—— সিদ্ধি ইত্যাদি যাহা কিছু, " সে সব বুদ্ধির ভ্রম দুঃসাধ্য সূচনা " (অথচ সদা কর তাঁহার সাধনা) ইহার পরেই বলিয়াছেন, "বিচিত্র বিশ্বনির্ম্মাণ, কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান, আছে মাত্র এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা।" দিগম্বর তাহার উত্তর দিয়াছেন — " আছে মাত্র এই জ্ঞান, তবে কেন গাও গান, চক্ষু মুদি কার ধ্যান, কিসের ভাবনা?" এই স্থানে দিগম্বর দেখাইয়াছেন যে, রায় মহাশয় কাযে কথায় এক নহেন। অন্য গানে রায় মহাশয়ের উক্তি—

" একি ভুল মন (তোমার)। দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন। আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে, আকাশের ছায় তারে মানা এ কেমন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত, তাঁরে দেখাইতে কত করহ যতন——পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে, চাই সেই পরাৎ-পরে করাতে ভোজন।"

যিনি যে কার্য্যের ফলের অভাব দেখেন, তিনিই তাহাকে ভুল বলিয়া মনে করেন— তাই রায় মহাশয় বলিতেছেন " একি ভুল মন!" যিনি ফল পাইয়াছেন তিনি অমনি বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে দেখিতে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন— " ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ঐ। আঁধারে করিছে আলো, ঐ যে আমার ব্রহ্মময়ী। পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে, লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে, চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়নে নিকলে, বদনে মাভৈঃ মাভৈঃ। অট্ট অট্ট হাস, বিকট বিকাশ, ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী,— করাল

বদনে সরল হাসিছে, মরালগমনে মেদিনী কাঁদিছে, তালে তালে তালে স্থঠাম নাচিছে, তাথৈ, তাথৈ।"

এই স্থানে আসিয়া দিগম্বর অন্যের কথায় উত্তর করিতে গিয়া নিজের কার্য্যের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন——সাধনা এই স্থানে বিচারকে পদদলিত করিয়া সাধককে সিদ্ধেশ্বরীর প্রত্যক্ষ মন্দিরে লইয়া গিয়াছেন, তথাতে গিয়া তিনি যাহা দেখাইতেছেন—তাহাতে সাধকের নিজের কথাতেই অবসর নাই, আর পরের কথার উত্তর করিবেন কি? নিদ্রার পূর্ব্বে কোন বিষয় চিন্তা করিলে স্বপ্নের সময় অন্য দৃশ্য দেখিলেও যেমন তাহার মধ্যে সেই সকল পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়ের অস্ফুট ছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়, আজ দিগম্বরেরও তদ্রূপ গান রচনার পূর্ব্বে "ভুল কি না" ইহা ভাবিতে গিয়া যে কয়টি বিষয়ের চিন্তা হইয়াছিল ধ্যানময় রচনা কালেও সেই আকাশ আর চন্দ্র সূর্য্যই জগদম্বার বিরাটরূপের মধ্যে অস্ফুট আভাসে দেখা দিয়াছেন— ইহা কেবল পূর্ব্ব চিন্তার সংস্কার মাত্র। দিগম্বর কিন্তু তখন "ঐ দেখ ঐ" বলিতে গিয়া যাহা দেখিয়াছেন, অথবা যাহা দেখিয়া "ঐ দেখ ঐ" বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি আত্ম-হারা। সাধক এই স্থানে একবার দেখিয়া লইবেন——সাধনায় আর জ্ঞান বিচারে কি স্বর্গ নরক পার্থক্য! ভুবনমোহিনীর মোহন-মাধুরীর তরঙ্গলীলায় যিনি এইরূপে ডুবিয়াছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচার বুদ্‌বুদ আর কি তাঁহার চক্ষুর লক্ষ্য হয়? আমরি মরি, কি সিদ্ধ সাধনা! প্রাণময়ী যেন প্রাণের কবাট খুলিয়া দিয়া ভক্তের নয়নে নয়নে খেলিতেছেন! সাধক প্রাণ ভরিয়া করতালি দিয়া আপনি দেখিয়া জগৎকে দেখাইতেছেন— ঐ দেখ ঐ—— মা আমার— করালবদনে সরল হাসিছে, যেন মরালগমনে মেদিনী কাঁদিছে, আবার তালে তালে তালে স্থঠামে নাচিছে—তাথৈ তাথৈ।" ধন্য সাধক তুমিই ধন্য, তোমার কল্যাণে ধরা ধন্য !!!

—— ——

আধ্যাত্মিক বাদ ।

আমাদের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত নিরাকাররোগগ্রস্ত সম্প্রদায়কে আমরা শত-গুণে শ্লাঘ্য বলিয়া মনে করি কারণ, ইহাঁদিগকে চিনিয়া লইবার উপায় আছে; কিন্তু ইহার পর সংক্রামক জ্বরগ্রস্ত আর একদল ব্যাখ্যাতা আছেন, যাঁহা-দিগকে সহজে চিনিবার উপায় নাই— অথচ তাঁহারা স্পর্শ করিলেও রক্ষা নাই। ইহাঁরা আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুই রাজ্য অতিক্রম করিয়া এখন আধ্যাত্মিকে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই কার্য্যে যাহাই কেন না হউক, নামে ইঁহারা আধ্যাত্মিকবাদী। ইহাঁদিগের প্রত্যক্ষ দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক সংসার পর্য্যন্তও প্রায় আধ্যাত্মিক, দেবতা ধর্ম্ম পরলোক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ রাজ্যের কথা ত দূরে আস্তাং। বেদ তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস যাহাই কেন না হউক ইহাঁদিগের মতে ইহার সমস্তই রূপক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপক, প্রকৃতি পুরুষ রূপক, দশাবতার রূপক, দশ মহাবিদ্যা রূপক, দেবদেবী সমস্ত রূপক, নারদাদি ঋষিগণ রূপক, মধু কৈটভ হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি রূপক, ধ্রুব প্রহ্লাদ শুকদেব সনাতন প্রভৃতি রূপক, পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি রূপক, বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সর চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষঃ ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব সমস্ত রূপক, কাশী কাঞ্চী অবন্তী অযোধ্যা মথুরা মায়া বিরজা দ্বারকা হস্তিনা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সমস্তই রূপক, ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে পিতা পিতামহের উপর হইতে ঊর্দ্ধতন এবং পৌত্র প্রপৌত্রের নিম্ন হইতে অধস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত রূপক; যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই সত্য, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু এ সংসারে অপ্রত্যক্ষ, সে সমস্তই রূপক। মূর্খলোকে শাস্ত্রের গুরুগভীর গুহ্যতত্ত্ব সকল বুঝিতে না পারিয়া চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করে—বস্তুতঃ পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পদার্থ সকলের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে—যথা বংশ শব্দে বুঝিতে হইবে, বাঁশের ঝাড়। পিতা পিতামহ প্রভৃতি সেই বংশস্তম্বের এক একটি পোর বা পুর, (তাহা-

তেই ভাষায় তাহাদিগের নাম হইয়াছে পূর্ব্বপুরুষ)। আর্য্যশাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রতিবৎসর তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ; শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যত্তু পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধ মুচ্যতে" শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে দান করা যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। প্রতি বৎসর তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে—অর্থাৎ প্রতি বৎসর বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এক এক ঝাড় নূতন বাঁশ বাটীতে লাগাইতে হইবে,—যাঁহাদিগের বাটীতে বাঁশের ঝাড় আছে, তাঁহারা এ নিয়ম বিশেষরূপে অবগত আছেন—ইহাই শাস্ত্রের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা——এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—যিনি প্রতিবৎসর পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার কখনও বংশ লোপ হয় না অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে কখনও বাঁশের- অভাব হয় না ইত্যাদি। এইরূপে বুঝিতে হইবে আর্য্যশাস্ত্রে উপাসনা ইত্যাদির যাহা কিছু বিধি ব্যবস্থা আছে, সে সমস্তই এইরূপ রূপক, কেবল গুহ্যতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার অভাবেই লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অন্যরূপ ভাবিয়া থাকে। সাধক! শ্রাদ্ধের ব্যাখ্যা যেমন শুনিলেন, দেব দেবীর উপাসনাদিরও এইরূপ সকল বিবিধ ব্যাখ্যা আছে—আজ কাল্ জন সাধারণে সে সকল ব্যাখ্যা বিশেষ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আর আমরা সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলুম না। ফল কথা, জানকীময়-জীবন ভগবান্ রামচন্দ্র মারীচের অনুসরণ করিলে পঞ্চবটী বনে যেমন বিকট রাক্ষস রাবণ, জটিল তাপস ব্রাহ্মণ বেশে ভিক্ষাচ্ছলে সূর্য্যকুল-মহালক্ষ্মীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন——আজ্ আর্য্যসমাজকেও তদ্রূপ অনাথ অসহায় বিজনবন সদৃশ লক্ষ্য করিয়া এই সকল ধর্ম্মরাক্ষসগণ ধীরে ধীরে ভিক্ষুকবেশে আসিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দ্বারে দাঁড়াইতেছেন, কালমাহাত্ম্যে ভগবান্ আমাদিগের অনেক দূরে, এক্ষণে কেবল ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধায়ী ভক্তগণের প্রদত্ত রেখার উল্লঙ্ঘন না করাই একমাত্র নিস্তারের পথ, তাই সামাজিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আজ্ তারস্বরে সাবধান করিয়া দিতে হইবে যে, জানকী যেন এ সময়ে লক্ষ্মণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে পদার্পণ না করেন, উপস্থিত ব্যাখ্যা-

কর্ত্তার দল, বাহিরে তাপস হইলেও অন্তরে রাক্ষস, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। যতক্ষণ ইহারা সাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে নিজের হস্তায়ত্ত করিতে না পারিবে, ততক্ষণই এই সকল মিষ্ট মিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া বলিবে—গোপীশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণ শব্দের অর্থ আত্মা, বস্ত্রশব্দের অর্থ লজ্জা, কদম্ববৃক্ষের অর্থ ষটচক্র; আকাশ তাঁহার সুনীল কান্তি, অরুণরাগ তাঁহার পীতাম্বর, ইন্দ্রধনুঃ তাঁহার মোহনচূড়া ইত্যাদি। তারপর যেমন দেখিবে এই সকল আপাত-মধুর কথায় ভুলিয়া সাধারণ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহাতে হুঁ দিয়া নিজ নিজ অধিকার-গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি তখন কপট-তাপস বেশ অন্তরিত করিয়া বিকট রাক্ষস-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বলিয়া বসিবে, "কৃষ্ণ" বলিয়া বা "তাঁহার লীলা" বলিয়া স্বরূপতঃ কোন পদার্থ নাই, মূর্খগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ রূপকচ্ছলে সেই নিরাকার ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তখন রাক্ষসের পৈশাচবল-নিষ্পিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আমাদের কাঁদিতে কাঁদিতে সাগর পারে যাত্রা করিবেন, পথে দুই একজন জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেও তখন তাঁহারা আর এ রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। —জানি ইহা যে, ভগবৎপ্রেয়সী ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ ব্যতিব্যস্ত—কিন্তু তাই বলিয়া সাধ করিয়া এ বিপদ ডাকিয়া আনা কেন? ইহাদিগের প্রদর্শিত মীমাংসা সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কিছুরই আর বিচার বিতর্ক করিবার সময় বা অপেক্ষা নাই, এখন দেখা হইলেই গৃহদ্বার হইতে "দূর হও" বলিয়া বিদায় দিবার ব্যবস্থা। তবে বিনা উপহারে অতিথিকে বিদায় দিতে নাই— এই বলিয়াই যিনি যাহা উপহার দেন !!!

সকলেরই সকল কার্য্যে একটা না একটা যাহা কিছু উদ্দেশ্য থাকেই থাকে, ইহাঁদিগেরও তাহা বিলক্ষণই আছে—তবে আমোদ এই যে, একটু অন্তস্তত্ত্বভেদ করিলেই যাহা সহস্র চক্ষুর সম্মুখে শত খণ্ডে ফাটিয়া পড়ে, ইহাঁরা কোন্ সাহসে সেই সাধের শিমুলের ফল এই প্রবল ঝড়ের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকেন। শাস্ত্র, দেবতাকে, দেবতার লীলাকে,

এবং লীলাধামকে রূপক বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু আমাকে বলিয়াছেন--ষষ্টি সহস্র যোজন পথ পর্য্যটন করিয়া সেই রূপক তীর্থকে সত্য সত্যই দর্শন করিতে হইবে— রূপক দেবতার জন্য আমার এই সত্য দেহকে সত্য সত্যই অস্থিকঙ্কালশেষ করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে, রূপক দেবতার জন্য সত্য সত্যই বলিতে হইবে— " মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং "। আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যাতা মহাশয় ত এ সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু আমি যে এখন কি বলিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করি— তাহাই ভাবিয়া অস্থির। ঘটনা যদি কিছুই নহে, তবে এ মিথ্যা রূপক বর্ণনা দ্বারা লোকের সহজ হৃদয়ে ভ্রান্তি বিস্তার করা কি শাস্ত্র-প্রচারক ভগবানের এবং ঋষিগণের ন্যায্য কার্য্য? লোকের সত্যজ্ঞান উদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত যে শাস্ত্রের অবতারণা, সেই শাস্ত্রের কার্য্য কি না, মিথ্যা পদার্থের বর্ণনা দ্বারা অন্ধতমসমোহসাগরে জগৎকে নিক্ষিপ্ত করা। জীবের গর্ভাধান হইতে শ্মশানকার্য্য পর্যন্ত, মাতৃগর্ভ হইতে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত, নরক হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণে প্রতিকার্য্যে অণু পর-মাণুরূপে মঙ্গলামঙ্গলের নির্দ্দেশ করিয়া যে শাস্ত্র জীবের ইহপরলোকের চিরবন্ধু—সেই শাস্ত্র কিনা মিথ্যা কল্পনা জল্পনাদ্বারা নিখিলজগৎকে রসা-তলে নিমজ্জিত করিতে উদ্যত? এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিবাদন করা উচিত, কি চণ্ডাল বলিয়া পরিহার করা উচিত, তাহা তাঁহারাই বলিয়া দিবেন। শাস্ত্রের সহিত বা ভগবানের সহিত জগতের কি এমন মর্ম্মান্তিক শত্রুতা ছিল যে, তিনি সেই বাদ সাধিবার জন্য উপরে সহজ অর্থের মধুর ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহার অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক-বিষের কুম্ভ সাজাইয়া রাখিয়াছেন? শাস্ত্র ত তোমার আমার মত নরপিশাচের স্বার্থজাল বিস্তার নহে — শাস্ত্রের প্রকাশক তিনি এবং তাঁহারা——যিনি বৈকুণ্ঠ পরিহার করিয়া ত্রিলোকরক্ষার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ এবং যাঁহারা তপোবলে অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইয়াও বিজনবন বিহারী জটাবল্কলধারী বিবেকবৈরাগ্যের সীমান্তচারী, অকারণ-

করুণাকারী। তাঁহারা যাহাকে সত্যের পর সত্য ত্রিসত্য করিয়া বলিয়া-গিয়াছেন, "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ন সংশয়ঃ" সেই ধ্রুব-সত্যকে যাহারা পাশব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করে—তাহাদিগকে যদি সত্যবাদী বলিব, তবে জগতে মিথ্যাবাদী কে? বড়ই হাসির কথা যে, আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ জ্যোতিষ এবং মন্ত্রময় তন্ত্রবিভাগ, ইহার কিছুই রূপক হইল না, রূপক হইল কেবল সকল-বেদেরই উপাসনা কাণ্ড। তুমি রূপক বলিয়া বুঝিয়াছ তাহাতে আপত্তি করি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রোগ হইলে ঔষধকে কেন রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা কর না? চন্দ্র সূর্য্যকে রূপক বলিয়া দিবা দুই প্রহরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রিতে কেন স্নান কর না? রূপক অলঙ্কার বুঝিয়া রস অনুভব করিবার কথা; কার্য্যে রূপক অলঙ্কারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা তুমি কোন্ কাব্যে পড়িয়াছ? দার্শনিকের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দুর্ভেদ্য সাধনতত্ত্ব ভেদ করিয়া যাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই সাধনে সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক দৈবতত্ত্ব সকলকেও যাঁহারা লোকসমাজে প্রত্যক্ষবৎ উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারদর্শী মহর্ষিগণ রূপাতীত স্বরূপ বুঝিয়াও তোমার আবিষ্কৃত এই রূপক বুঝিতে পারেন নাই, ইহা বলিতেও কি তোমার পাপজিহ্বা সহস্রধা বিদীর্ণ হয় না?

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই আবহমান কাল পরম্পরায় ত্রিজগতের সিদ্ধ সাধু সাধক পণ্ডিতমণ্ডলী এত দিন যত কিছু যাগ যজ্ঞ ধ্যান জ্ঞান জপ তপঃ পূজা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, ইহার সমস্তই পণ্ডশ্রম? কেহই এই রূপকপ্রাণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই? কলি-রাজের কল্যাণে আজ বলিহারি তোমার গবেষণায়! আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ "আত্মানমধিকৃত্য যৎ" আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা হয়, তাহারই নাম আধ্যাত্মিক; আত্মা নিরাকার, সুতরাং আত্মাতে যাহা কিছু হইবে, সে সমস্তও নিরাকার হইবারই কথা—তবেই প্রকারান্তরে সাকার-বাদ মিথ্যা হইতে চলিল—কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ (সাপও মরে, লাঠিও না

ভাঙ্গে ; সাকারবাদও উঠিয়া যায়, কিন্তু সমাজও না চটে) এই জন্যই আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের প্রতি এত অচলা ভক্তি, এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রের ধ্বজা ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সকল আজ কাল আবার সমাজ ছাড়িয়া সভায় সভায় বিক্রীত বিতরিত বিলোড়িত হইতেছে —এই জন্যই কপট পাষণ্ডগণ ধর্ম্মপ্রচারের ভান করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অধর্ম্ম প্রচারে দেশে দেশে ঘুরিতেছে, এই জন্যই সরল সাধু সভ্যগণ সহজ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া শাস্ত্র বলিয়া ঐ সকল শাণিত শস্ত্র সঞ্চয় করিয়া এখন তাহার খরতর ঘাতে ঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছেন।—উপরে ঐ শাস্ত্র নামের বাহ্য চাক্‌চিক্য আছে বলিয়াই ধর্ম্মদস্যুদল এখনও ধার্ম্মিকের আশ্রমে স্থান পাইতেছে—কিন্তু শুভসংবাদ এই যে, দীনদয়াময়ীর দয়ায় দিন পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া ঠেকিয়া সকলেই এখন প্রায় শিখিয়া উঠিয়াছেন। তথাপি আমরা যাহা বলিলাম তাহা কেবল "বিদিতে চাপি বক্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ" ॥ বিদিত থাকিলেও সুহৃদ্গণ অনুরাগবশতঃ তাহা পুনর্ব্বিদিত করিয়া দিবেন" বলিয়াই ; তাই আবার বলিয়া দিতেছি—সমাজ! সাবধান! সাবধান। সাবধান!!! ওলাউঠা বসন্ত ম্যালেরিয়াকে ভয় কর বা না কর— আধ্যাত্মিক গুরুকে দেখিয়া সভয়ে প্রচণ্ড দণ্ডবৎ করিতে ভুলিও না। ভুলিও না। ভুলিও না!!!

কিসে, কি ভাবে, কেন, কোথা হইতে, কিরূপে এ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, পরবর্ত্তী বিষয় সকলের অবতারণায় হয় ত আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে, এজন্য এক্ষণে আর সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না।

বাহ্য পূজা।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে——

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বাহ্যপূজাঽধমাধমঃ। ১।

যোগো জীবাত্মনো রৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো নচ পূজনং ॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্তার অনুভব ইহাই উত্তম ভাব, ধ্যান মধ্যম ভাব, স্তব এবং জপ অধম ভাব, বাহ্য পূজা তদপেক্ষাও অধমাধম ভাব। ১। জীব এবং পরমাত্মায় একত্ব জ্ঞান বা একত্ব সাধনের নাম যোগ, তিনি ঈশ্বর এবং আমি সেবক, এই উভয় কোটি জ্ঞানের অবলম্বনেই পূজা; কিন্তু সমস্তই ব্রহ্ম ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার আর যোগও নাই, পূজাও নাই। ২।

নিরুত্তর-তন্ত্রে——

উত্তমা মানসী পূজা বাহ্যপূজা কণীয়সী।
পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
হোমেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ
বীরাণাং মানসী পূজা দিব্যানাঞ্চ কুলেশ্বরি ॥

মানসী পূজা উত্তমা, বাহ্য পূজা তদপেক্ষা কণীয়সী। দেবতার পূজা করিয়া জনসমাজে সাধক স্বয়ং পূজা লাভ করেন। জপ হইতে মন্ত্রসিদ্ধি নিঃসংশয়, হোমের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লব্ধ হয়; সেই হেতু সাধক পূজা জপ হোম এই ত্রিতয়েরই অনুষ্ঠান করিবেন। কুলেশ্বরি! বীরাচার এবং দিব্যাচার সাধকগণ মানসী পূজার অধিকারী অর্থাৎ বাহ্য পূজা ব্যতিরেকে কেবল মানস পূজায় ইহাঁদিগেরই অধিকার।

এইরূপ অন্যান্য তন্ত্রও বাহ্যপূজাকে নিম্নাধিকার বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল বচন প্রমাণই আজ কাল সাধারণ সমাজে অকালপ্রলয়-মহাধূমকেতুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাম্ভিক বিজ্ঞদল প্রায়শঃই বাহ্যপূজা-পরাঙ্মুখ; অধিকন্তু বাহ্যপূজার বিরোধী। তাঁহাদিগের দৃঢ় ধারণা এই যে, বাহ্যপূজা অধমাধম, সুতরাং উহা করিলেই অধম হইতে হয়—অথবা যাঁহারা অধমাধম নরাধম তাহারাই উহা করিবে, আমরা উহা করিব কেন? আমরাও স্বীকার করি যে—

বাহ্যপূজা অধম ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধম কাহা হইতে ? তত্ত্বজ্ঞান হইতে অধম, ধ্যান হইতে অধম, স্তব জপ হইতে অধম ? না, এ সকল ছাড়িয়া তাঁহারা যাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইতেও অধম ? বাহ্যপূজা অধম-অধিকার সত্য, কিন্তু তুমি এমন কি নরোত্তম হইয়াছ যে, বাহ্যপূজার নাম শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর ? গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ক খ লেখা, বিদ্যাশিক্ষার নিতান্তই নিম্নাধিকার, কিন্তু তাই বলিয়াই মনে করিয়াছ কি, বর্ণজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী মহর্ষি হইবে ? যদি কখন কাহারও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে, তবে জানিবে তাহা কেবল ঐ গুরুমহাশয়ের নিকটে ক খ লেখার কল্যাণেই জন্মিয়াছে ; তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানে যদি কেহ কখন অধিকারী হইয়া থাকেন, তাহাও জানিবে এই বাহ্যপূজার প্রসাদেই। ছাত্র শেষে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ছাড়িয়া টোলে কলেজে আসিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ক খ ছাড়িয়া আসে না ইহাও ধ্রুব সত্য। ক খ জ্ঞান যখন চিরজীবনের অপরিহার্য্য দৃঢ় সংস্কারে অভ্যস্ত হইয়া আসে, তখন সেই ক খ তরণী আশ্রয় করিয়াই বালকগণ অপার শাস্ত্রসাগরে প্রবেশ করিয়া থাকে ; তদ্রূপ প্রথমে পরম গুরুর পাঠশালায় বাহ্যপূজায় পরম দেবতার পদাম্বুজ সাধনায় ধ্যান ধারণা সংস্কার দৃঢ় হইলেই সাধক সেই অভয় চরণতরণী সহায় করিয়াই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ভবপারে উত্তীর্ণ হয়েন। বিদ্যার সাধনায় গুরু মহাশয়ের ক খ লেখার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, মহাবিদ্যার সাধনাতেও গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রময়ী দেবতার উপাসনার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। যে শাস্ত্রে যে সাধনায় যাত্রা করিবে, মন্ত্রময় ক খই তোমার সে সঙ্কটে উদ্ধার করিবেন—শাস্ত্র যত কেন দূর পারাবার না হয়, একমাত্র ক খ যেমন অগ্রসর হইয়া তোমাকে তাহার পারান্তরে লইয়া যাইবে— তদ্রূপ জ্ঞান যোগ সমাধিতত্ত্ব যত কেন দূরান্তর না হয়, মন্ত্রময়ী মহাদেবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার কর ধরিয়া তাহার অপর পারে লইয়া যাইবেন— জ্ঞান যোগ সমাধি যাহারই কেন অনুষ্ঠান না করি, দেখিব তাহার সকলের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বরী

আনন্দময়ী মুক্তকেশী মা আমার আনন্দে হাসিয়া হাসিয়া নাচিতেছেন, তাঁহারই অশ্রান্ত নৃত্যভরে আমার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রেমের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পাড়তেছে। ভাই! ভ্রান্ত তুমি, কাহার কাছে শুনিয়াছ যে, আমার মা ছাড়া আবার সাধন ভজন ধ্যান জ্ঞান ভুক্তি মুক্তি এ সংসারে আর কিছু আছে? আমার সাধনায় মা, সাধ্যে মা, সিদ্ধিতে মা, সিদ্ধে মা; আদিতে মা, মধ্যে মা, অন্তে মা, উপান্তে মা—সব গিয়া শেষে কেবল যাহা টিকিবে—তাহাও জানিবে কেবল মা— মাকে মা বলিতে কেহ না থাকিলেও, তখনও জানিবে— কেবল— মা; কেন না, মা আমার, আমারও মা, ছেলেরও মা, বাবারও মা, মায়েরও মা——মা মায়েরও মা, তাই সব হারাইয়াও মা-মা। মা! সে দিন কবে আসিবে? যে দিন সব হারাইয়া শব সাজিয়া আমরাও দেখিব কেবল মা!!

বাহ্যপূজার এই অনুষ্ঠান উড়াইবার জন্য কত নজীর কত প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ রামপ্রসাদের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া বলিতেছেন——"তিনি কি মাটীর কালী পূজা করিতেন?—কখনই না! তিনি বলিয়াছেন "হৃৎকমলে মঞ্চদোলে করালবদনী" যেন রামপ্রসাদের কালী আর কখন বাহিরে আসিতেন না, অথবা যাহারা মাটীর কালী পূজা করে, তাহাদের কালী আর কখন হৃৎকমলে দাঁড়ান্ না——কথা শুনিলেই হাসি পায় "মাটীর কালী"। ভাই সমালোচক! কালী মাটী হইলেও তিনি খাঁটি, কিন্তু তুমি যে অস্থিমাংসের মানুষ হইয়াও মাটি হইলে এই দুঃখই চিরস্মরণীয়; জানিনা তোমার অদৃষ্টে কবে সে দিন আসিবে, যে দিন ঐ মাটীর মধ্যে মাটী ভেদ করিয়া মা-টি তোমায় দেখা দিবেন? যে দিন তুমি বুঝিবে মাটী মাটী হইলেও মা-টির তাহাতে অভাব নাই!!! রামপ্রসাদ বলিয়াছেন——"শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা" রামপ্রসাদের সহস্র গানের মধ্যে কেবল এইটিকেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে—এইটিকেও নহে, এই টুকুমাত্র; যে টুকুতে 'নিরাকারা" আছে। যেন রামপ্রসাদ দিব্য করিয়া বলিতেছেন—আমি আর যত যাহা

কিছু বলিয়াছি সে সমস্তই মিথ্যা কথা—কেবল "তারা আমার নিরাকারা" এই টুকু খাঁটি সত্য। আর———

"মা! কত নাচ গো রণে—
নিরুপম বেশ, বিগলিতকেশ,
বিবসনা হরহৃদে—কত নাচ গো রণে॥

শ্যামা বামা কে?
তনুদলিতাঞ্জন—শরদসুধাকরমণ্ডলবদনী—
কুন্তল বিগলিত, শোণিতশোভিত,
তড়িতজড়িত নবঘন ঝলকে॥

ও কে রে মনোমোহিনী—ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢলতড়িতপুঞ্জ মণিমরকতকান্তিচ্ছটা—
ও কে রে মনোমোহিনী

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে—
গলিতচিকুর আসব-আবেশে
রণে দ্রুতগতি চলে, ধরে মম দলবলে,
করতলে গজগরাসে।

আরে ঐ এল কে রে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা, লাজবিরহিতা
ভুবনমোহিতা, একি অনুচিতা, কুলের কামিনী॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ, লোলিতরসনা গলিতকেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে, হেরি বেশ; হুঙ্কাররবে দনুজদলনী॥"

এ সকল যেন স্বপ্ন প্রলাপ, অথবা বাজে কথা, কাযের কথা যেটুকু তাহা কেবল ঐ "নিরাকারা"। সমালোচক! ধন্য তোমার নিরপেক্ষ সমালোচনা!!!

রামপ্রসাদ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহার মুখে বড় একটা নিরাকারের কথা কিছু শুনিতে পাওয়া যায় নাই—তার পর যখন তিনি মাটীর কালী পূজা করিতেন না—অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার মহানিশাতে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর পূজা সমাপন করিয়া পর দিন প্রভাতে জগদম্বার মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দিবার জন্য যাত্রা করেন—সেই সময়ে গঙ্গাতীরে মায়ের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে অবতীর্ণ হইয়া মায়ের সম্মুখে মা-য়ের ছেলে আজ "কেবল মায়ের" হইয়া দাঁড়াইলেন, বাহিরে মায়ের মূর্ত্তিতে দৃষ্টি স্থির করিয়া সংহারমুদ্রায় সমাধিস্থ হইয়া বাহির হইতে মা'কে এক-বার অন্তরে ডাকিলেন—অন্তরের ধন অন্তর্যামিনী কৃতান্তদলনী মা অমনি সন্তানের লীলান্তকাল বুঝিয়া অন্তরে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেন, আনন্দ-ময়ীর অভয় দৃষ্টিতে ভবভয় ঘুচিয়া গেল, নৃত্যকালীর প্রেমের নৃত্যে প্রাণের কবাট খুলিয়া গেল—প্রেমানন্দে ঢল ঢল অলস দেহ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, আনন্দ-স্তিমিত চক্ষু ছল ছল উছলিল, সাধক জন্মের মত সাধ মিটাইয়া সাধের সাধনা শেষ করিয়া প্রাণের তন্ত্রী বাজাইয়া আজ গান ধরিলেন——

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে। নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।

মাভৈঃ শব্দে ঘন ঘন, গর্জ্জে ধারাধরে। তাহে, প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥

স্থির দৃষ্টি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে। তাহে, প্রাণচাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥

ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম জন্ম পরে। রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥

প্রাপ্তির পরেও উৎকট আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, " আর জন্ম হবে না জঠরে " ইহা যথার্থতঃ জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সে আকাঙ্ক্ষা আরও শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন জগদম্বার ভাবি-অদর্শনে বিচ্ছেদযন্ত্রণা

নিতান্তই অসহ্য বোধ করিয়া মাতৃপ্রাণ সাধক আবার মায়ের চরণতলে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন ——

এমন দিন কি হবে তারা। যে দিন, তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।

হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে; অম্‌নি, ধরাতলে পড়ব লুঠে, তারা বলে হব সারা॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ; ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে; আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা॥

তারা! এমন দিন কবে হইবে? যে দিন তুমি নিরাকারা হইবে! যে দিন হৃৎপদ্ম ফুটিয়া উঠিবে, মনের আঁধার ছুটিয়া যাইবে, অমনি ধরাতলে লুঠিয়া পড়িয়া তারা বলিয়া সারা হইব, যে দিন ভেদ অভেদ সব ত্যাগ করিব, মনের খেদ ঘুচিয়া যাইবে, সেই দিন—শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা। "তারা নিরাকারা" এ বেদ বাক্য সেই দিন আমার পক্ষে সত্য হইবে। আমার এ আকার যে দিন ঘুচিয়া যাইবে, সে দিন তারাও আমার নিরাকারা হইবেন, তারা নিরাকারা হইবেন না, আমার পক্ষে নিরাকারা হইবেন, ইহাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন; কেন না আমি সাকার আছি বলিয়াই তাঁহার উপাসনা। আমার এ আকার ঘুচিয়া আমি যে দিন তাঁহার চিৎস্বরূপ মহাকৈবল্যে বিলীন হইব, সে দিন আমিও যেমন নিরাকার, আমার তারাও তেমনই নিরাকারা——বেদবাক্যে তারার নিরাকারত্ব উপলব্ধি করিবার যথার্থ উপযুক্ত সময় আমার সেই দিন আসিবে—সে দিন আমার আমিত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমার যেমন থাকিবে না, তারার তারাত্ব বা তাঁহার সাকারত্ব অথবা তাঁহার তিনিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমার তেমনই থাকিবে না—তাই আমার চক্ষে তারার যদি কোন দিন নিরাকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা সেই দিন

সম্পন্ন হইবে, তদ্ভিন্ন যত দিন আমার আমিত্ব আছে—আমি আছি, তত দিন তারাও আমার তারা আছেন, সাকার আছেন, মা আছেন ইহা নিঃসংশয়। এখন বল দেখি। রামপ্রসাদ তারাকে সাকার বলিয়াছেন কি নিরাকার বলিয়াছেন? রামপ্রসাদ বলিয়াছেন বলিয়া নজির দেখাইতে যাও—কিন্তু রামপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে যে, তোমার এখনও অনেক দিন বাঁকি, এ টুকু বুঝিতে পার না এই বড় দুঃখ!! আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি—রামপ্রসাদ বলিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহাকে গুরু বলিয়াই তাঁহার কথা মানিয়া চলিতে চাও, অথবা তিনি তোমার মনের মত কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কথাকে নজির দেখাইতে চাও? কিম্বা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া একে আর ঘটাইয়া অথবা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপক্রম উপসংহার আদ্যন্ত ভাগ চুরি করিয়া মাঝের একটি ছিন্নজঙ্ঘা ছিন্নমস্তা কথা উঠাইয়া লোককে ভয় দেখাইয়া আপন দলে আনিতে চাও? যদি রামপ্রসাদকে গুরু বলিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতে, তাহা হইলে আর, সহস্র গানের মধ্য হইতে "শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা" এ টুকু উদ্ধৃত করিলে কেন? ইহা দেখিয়াই ত বোধ হয়—নিরাকারের সঙ্গে তোমার—নিরাকার প্রেমের নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা আছেই আছে, এই খানে আসিয়াই ত পক্ষপাত করিয়াছ, আর উড়িতে চাও কোন্ সাহসে? মধ্যস্থ হইয়া কোন মতের মীমাংসা করিতে হইলেই সেখানে একটু সাবধান এবং বিলক্ষণ নিঃস্বার্থ থাকিতে হয়, আপন স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া তুমি যেখানে কার্য্য করিবে, সেখানে সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হইবে কিরূপে? নিরাকার প্রতিপাদক কথাটি তুলিয়াছ, ভাল। তাহাতে ত কেহ আপত্তি করিতেছে না, এখন জিজ্ঞাসা এই যে, তুমি সহস্র গানের মধ্য হইতে একটি নিরাকার শব্দ বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া আনিতে পারিলে, আর সহস্র গানের মধ্যে—শত সহস্র লক্ষ সাকার কথার মধ্যে—একটি সাকারও তুমি উঠাইতে পারিলে না, ইহার অর্থ কি? অবশ্য নিরাকার অপেক্ষা সাকার অনেক ভার, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ

তাহা দশের ভার — চিরকাল ত্রিজগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের লোক যাহার ভার বহন করিয়া আসিতেছে—তুমি একা তাহার ভার বহন করিবে কিরূপে ? তোমার যেমন দেহ সূক্ষ্ম, মন সূক্ষ্ম, উপাসনা সূক্ষ্ম, ভাগ্যক্রমে উপাস্যদেবতাটিও জুটিয়াছেন—তেমনই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মতম, একেবারে— নিরাকার, ইহাঁর ভার তোমার পক্ষেই উপযুক্ত ; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ন্যায় জীবের পক্ষে সাকার দুর্ব্বহ হইলেও সে দুর্ব্বহ ভারের কথাটী একেবারে চাপিয়া রাখা কর্ম্মটা ভাল হয় নাই—নিজে উঠাইতে না পারিলেও অন্ততঃ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, রামপ্রসাদ সহস্র সহস্র বার সাকারের কথা বলিতে বলিতে একবার নিরাকারের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা তোমার আমার পক্ষেও নহে, রামপ্রসাদের পক্ষেও নহে, রামপ্রসাদের রামপ্রসাদত্ব ঘুচিয়া গিয়া উপাস্য—উপাসক সম্বন্ধ অতীত হওয়ার পক্ষে।

"শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে, আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা" মা আমার সর্ব্বভূতে বিরাজিতা, কিন্তু অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ চক্ষু! জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে তুমি যে, তাঁহাকে দেখ না ইহাই দুঃখ! ততোধিক দুঃখ এই যে, মা তিমিরহরা, তথাপি তুমি তাঁহাকে তিমিরে দেখিতে পাও না! চন্দ্র সূর্য্য জগতের অন্ধকার হরণ করেন ইহা সত্য, কিন্তু অন্ধের অন্ধকার ত তাহাতে ঘুচিবার নহে, দুর্ভাগ্যক্রমে দৃষ্টি বিষয়ে অন্ধ, চক্ষুষ্মানের রাজ্য হইতে দূরে অপসৃত—জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মদোষে অন্ধ স্বয়ং দৃষ্টিহীন; বাহিরের অন্ধকার হইলে তাহা সূর্য্যকিরণে ঘুচিবার কথা ছিল, এ যে অন্ধের নয়নগত অন্ধকার——অন্ধকার আর কিছুই নহে——দৃষ্টিশক্তির বিকাশের অভাব, সে অভাব বাহিরের কোন কারণে ঘটে নাই—ঘটিয়াছে আমার আন্তরিক কোন কারণে——যে কারণের নাম দুরদৃষ্ট। আজ শুভাদৃষ্টের অনুষ্ঠানের বলে যদি আমি সে দুরদৃষ্ট খণ্ডন করিতে পারি, যদি দেবতার অনুগ্রহে পুনর্দৃষ্টি পাই—তবেই আমি তখন তিমিরের মধ্যেও "মা তিমিরহরা" ইহা প্রথমে

দেখিয়া পরে তিমির হারাইয়া মাকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পারি, কেন না সূর্য্যের তিমিরহারিণী শক্তির দর্শন না পাইলে সূর্য্যকেও দর্শন করা ঘটে না, প্রদীপের প্রভা ব্যতীত প্রদীপদর্শন হয় না, বিদ্যুতের দীপ্তি ভিন্ন বিদ্যুদ্দর্শন হয় না, তদ্রূপ মা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী হইলেও মায়ের শক্তি-স্ফুরণ ব্যতীত মায়ের দর্শন লাভ ঘটে না। তিনি নিত্যজ্ঞানানন্দময়ী, তাঁহার জ্ঞানকলার আলোক ব্যতীত কাহার সাধ্য তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী সত্তার অনুভব করে! মা তিমিরহরা ইহা সত্য, কিন্তু আমি যে কর্ম্ম-দোষে অন্ধ, তাহার কি? আমার এ অন্ধকার ত বাহিরের নহে, এ যে অন্তরের —অন্ধকার! সাধক বলিতেছেন, তাহাতেও ভয় নাই—এ অন্ধকারও যেমন অন্তরের, ইহার চন্দ্র সূর্য্যও তেমনই অন্তরের। তিনি যে—অন্তরের অন্তঃস্তরে সমুদিত, অন্ধকার অন্তরের হইলেও সেখানে তাহা বাহিরের বলিয়াই পরিগণিত; কেননা, যেখানে তাঁহার অভয় জ্যোতির্ম্ময় করশক্তি প্রসারিত হইয়াছে, অন্ধকার সেই স্থান হইতে সুদূরে পলায়ন করিয়াছে—তাই অনন্তকোটী—চন্দ্রসূর্য্যকটাক্ষধারিণী জগদম্বার শরণাপন্ন হইতে হইলেই অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে হয়, অথবা অন্ধতমস পাতালপুরে বাস করিলেও তাঁহার করুণাকিরণে পাতালও তখন চন্দ্রলোক-সমুজ্জল হইয়া উঠে—তাই তুমি অন্তরে অন্ধ হইলেও তিনি যেখানে আছেন, তাহা অপেক্ষা এ অন্তরকেও বাহির বলিয়া জানিবে। এই জন্যই রামপ্রসাদ নিজ চক্ষুকে অন্ধ জানিয়াও বলিতেছেন—আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে। কেননা—তুমি তিমিরে অন্ধ থাকিলেও তিনি যে, তিমিরহরা——সে তিমির যখন ঘুচিবে, তখনই দেখিবে—"মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে!" বস্তুতঃ রামপ্রসাদ অন্ধ জীব হইলেও যে সময়ে এ কথা বলিতেছেন, তখন তিনি অন্ধ নহেন, গত জীবনের অন্ধত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—"আঁখি অন্ধ!" এখন যাহা দেখিতেছেন, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহারই মৌখিক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন—দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা—আর

তিমিরের ভয় নাই——তিমিরহরা আসিয়াছেন—তাই এই বেলা দেখিয়া লও—"মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।"

"এমন দিন কি হবে তারা!" রামপ্রসাদের এই কাতরকণ্ঠে প্রাণের প্রার্থনা তারা আজ স্বয়ং সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন, সুতরাং সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবার নহে। লোকে দেখিতেছে, রামপ্রসাদ আজ মাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য গঙ্গাতীরে মাকে লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু মা দেখিতেছেন রামপ্রসাদ আজ আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য গঙ্গাতীরে মাকে লইয়া আসিয়াছেন, লৌকিক রামপ্রসাদের লোকলীলা সম্বরণ করিবার জন্য— বড় সাধের কোলের ছেলে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, ভক্ত পুত্রের ভবযজ্ঞের দক্ষিণান্ত করিবার জন্য, স্বয়ং দক্ষিণা আজ প্রত্যক্ষ মুর্ত্তিতে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্রবিসর্জ্জিত মূর্ত্তিতেও মায়ের অন্তরাবির্ভাব ফুটিয়া উঠিল, জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিস্তরঙ্গে গঙ্গার তরঙ্গ মিশিয়া গেল, সেই সঙ্গে রামপ্রসাদের প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রামপ্রসাদের বারাণসী প্রত্যক্ষ হইল, "কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি। আমার তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী।" "কেন হব তীর্থবাসী, শ্যামার চরণতলে দেখব কত গয়া গঙ্গা বারাণসী" "আর কাজ কি আমার কাশী, কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি" অনেক দিনের এ সকল কথা আজ সার্থক হইল।

"যে দিন, তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা" "অমনি ধরাতলে পড়ব লুঠে তারা বলে হব সারা" দীনতারিণী মায়ের কৃপায় সত্য সত্যই সে দিন তখন আসিয়া উপস্থিত হইল, কালকাদম্বিনী কালমোহিনীর কালোরূপের আলোর ছটায় দিনরাত্রি সমান হইয়া উঠিল—সে রূপের তরঙ্গরঙ্গে ত্রিভুবন ডুবিয়া গেল, কালো মেয়ের কালো ছেলে কালসাগরে সাঁতার দিয়া এত দিনে মায়ের কোলে কূলে গিয়া উঠিলেন—হৃদয়মন্দির উদ্ঘাটিত করিয়া বাহিরের মা অন্তরে আনিয়া কালবিজয়ী কালীনামের গভীর হুঙ্কারে গঙ্গাতট কাঁপাইয়া দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালী-

পূজার প্রাণপূর্ণ আহুতি দিয়া কালীর কুমার এত দিনে কালীর কোলে ঘুমাইলেন— রামপ্রসাদের ভবলীলার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপূজা সাঙ্গ হইল, কিন্তু বিসর্জ্জন আর ঘটিল না। আমরা বলি, ধন্য মায়ের প্রিয় পুত্র! মায়ের পূজা করিয়া সংহারমুদ্রায় মায়ের বিসর্জ্জন কেমন করিয়া দিতে হয়, তাহা তুমিই যথার্থ শিখিয়াছিলে! ধন্য জননি বঙ্গভূমি! তুমিই সন্তানকে যথার্থ সুশিক্ষিত করিয়াছিলে, মহাবিদ্যার মহামন্ত্রে রামপ্রসাদকে ধন্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলে, যাহার প্রসাদে তাঁহার বিসর্জ্জনের উপার্জ্জনও কি ইহলোকে কি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় অমোঘ অব্যয় হইয়া রহিল। আজ রামপ্রসাদের সেই বিসর্জ্জনে-উপার্জ্জিত ধনে ভারতের লক্ষ লক্ষ পথের কাঙ্গাল লক্ষপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া তাহা ভোগ করিতেছেন— জয় মা! তোমার প্রসাদের জয়!!

সাধক এখন একবার দেখিয়া লইবেন—রামপ্রসাদের তারা কেমন নিরাকারা। রামপ্রসাদ একদিন এক সময়ে তারাকে নিরাকারা বলিয়া ছিলেন—যে দিন যে সময়ে তিনি আর নিজে রামপ্রসাদ ছিলেন না— আজ তাঁহার সেই পরব্রহ্মসমাধির সময়ের সুর ধরিয়া অসুর সম্প্রদায়ের তারাকে "নিরাকারা" বলা বড়ই সুবিধার কথা। কেন না, সাকার তারার নাম শুনিলেই অসুরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তারা নিরাকারা না হইলে আর ও সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হইবার নহেন; কিন্তু তাহা হইলেও রামপ্রসাদের সে বিদেহকৈবল্যের অনুভব যতক্ষণ না হইতেছে—ততক্ষণ ত এ নজির নামঞ্জুর। রামপ্রসাদ যেমন তারাকে নিরাকার বলিয়াছেন, অমনি নিজে নিরাকার হইয়াছেন, আর ইহাঁদিগের ত দেখিতেছি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে এ কাল পর্য্যন্ত দিন রাত্রি যতই "নিরাকার নিরাকার" করিতেছেন, ততই সাকারে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছেন, বলিতে পারি না এ কোন্ দেশী নিরাকার? রামপ্রসাদের তারা নিরাকারা ছিলেন, তিনি সাকার মানিতেন না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, আবার বলা হইতেছে "তিনি যেন মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিয়াই

কালীপূজা করিয়া ছিলেন এবং পরদিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময় অর্দ্ধ-নাভি-গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জীবনের শেষসঙ্গীত গাইতে গাইতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই, ভাবে মৃত্যু।।" বলিহারি কলিদূতের সিদ্ধান্ত।।! সাকার মানিতেন না, কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া সাকার প্রতিমায় কালীপূজা করিয়া ছিলেন এবং পর দিন সেই পূজিত প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়! সাকার মানিতেন না, তবে কি সাকার কালীপূজা করিলেন, মৃত্যু-ভয়ে? তাহা হইলেও ত সমালোচক ভায়ার বুঝিয়া রাখা উচিত ছিল যে—বাঁচিয়া থাকিতে সাকার মানি বা না মানি, মরিবার সময় এক দিন মানিবার কথা আছে, এ হেন রামপ্রসাদকেও মানিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদ নিরাকার-সত্তার অনুভবের সম্পূর্ণ অধিকারী সিদ্ধ হইয়াই নিজের পক্ষ হইতে তখন একবার মাত্র বলিয়াছেন "তারা আমার নিরাকারা"। আমরি মরি! প্রাণগত সাধনাপ্রেমের কি অতুল্য অমোঘ বল—"নিরাকারা" যে, তখনও "তারা আমার"। নিরাকারা হইলেও তারা আমার তখনও "তারা" তারার নিরাকার সত্তায় তাঁহার সাকারত্ব ডুবিয়া যাইবে ইহা সাধকের প্রাণের কথা নহে, আমার সাকার তারাই তখন আমাকে তাঁহার নিরাকার-সত্তাসাগরে ডুবাইবেন, আমি আমার আমিত্ব হারাইয়া কেবল তাঁহার তিনিত্বে বিলীন হইব। মায়ের অঙ্কে অঞ্চলের আবরণ মধ্যে শিশু যেমন নিদ্রিত হয়, আমার অনন্তব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী সাকার মায়ের নিরাকার কৈবল্য-গর্ভেও আমি তেমনই বিলীন হইব, ইহাই ভক্তিরাজ্যের সিদ্ধাবস্থা—এতদ্ভিন্ন সাধনাবস্থায় কখনও তাঁহার হৃদয়ে নিরাকার সত্তা স্থান পায় নাই, বরং নিজের বা সাধারণের কথা দূরে থাক্, যোগীর পক্ষেও তাহা অসম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দেবতার মন্ত্রময় স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ——

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥

এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণি।
তথাচ তোমাকে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে শিব জীব।
কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগমসার।
কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ি। হ'য়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালোরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমন কর নির্ব্বাণ কে চায়?॥

সমালোচক মহাশয় এই স্থানে আসিয়াই বিদ্যাবুদ্ধির সিন্ধুক খুলিয়া বসিয়াছেন——"বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য" শুনিয়াই অজ্ঞান, অধীর, আহ্লাদে টল টল। "বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য" ইহা রামপ্রসাদের কথা নহে, সাধনাহীন দাম্ভিকদলের অসার বাগাড়ম্বরমাত্র; রামপ্রসাদ তাহার প্রতিবাদ করিয়াই বলিতেছেন——"সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য" এই টুকুই রামপ্রসাদের নিজের কথা। যাহারা বলে নিরাকারে লয় ব্যতীত নির্ব্বাণমুক্তি হয় না, রামপ্রসাদ তাহাদের প্রতি, তাহাদের প্রতি কেন? যিনি মুক্তিদাত্রী, তাঁহার প্রতিই ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন——"প্রসাদ বলে কালোরূপে সদা মন ধায়, যেমন রুচি তেমন কর নির্ব্বাণ কে চায়" তোমার নিরাকারসত্তার উপলব্ধি ব্যতীত যদি নির্ব্বাণমুক্তি না হয়, না হউক, তাহাতে কিসের ক্ষতি? তোমাকে পাইলে তোমার নির্ব্বাণমুক্তি চায় কে? যেমন রুচি তেমনি কর, হয় মুক্তি দাও, না হয় না দাও, তথাপি কালোরূপ ছাড়িয়া অন্যদিকে মন ধাইবার নহে। তাঁহাকে ছাড়িয়া য[illegible]রা নিজের মুক্তি-র

জন্য লালায়িত হয়, তাহারা তাঁহার অপার অনন্ত অগাধ গভীর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অধিকারী নহে——গীতান্তরে রামপ্রসাদ এই কথাই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন——

আ'র কায কি আমার কাশী,
কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।
হৃৎকমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথার ব্যথা,
অনলে দাহন যথা করে তুল রাশি——
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী——
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবলে এলোকেশী॥

নির্ব্বাণমুক্তি চাওয়া ত দূরে থাক্, পাওয়া পর্য্যন্তও তাঁহার রুচি-বিরুদ্ধ। তিনি বলিতেছেন——"চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি" চিনি হইয়া যদি তাহার রস আস্বাদনই করিতে না পারিলাম, তবে এ চিনি হইলাম কিসের জন্য? যদি বল সংসার-দুঃখ নিবৃত্তির জন্য! রামপ্রসাদ অমনি বলিতেছেন——আমি যে রাজ্যে বাস করি, তাহাতে সংসারও নাই, দুঃখও নাই—যাহার দুঃখ আছে, সে তাহার নিবৃত্তি করুক্ গিয়া। তোমার এক মুক্তি কেন? আমার, চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবলে এলোকেশী।" যাঁহাকে ধ্যান করিলে "চতুর্ব্বর্গ আপনি আসিয়া অযাচিতরূপে উপস্থিত হয়, তাঁহাকে ধ্যানে পাইলে যে কি হয়, তাহা কি আর ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য আছে?

সমালোচক দ্বিতীয় কথা ধরিয়াছেন——"কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার" কেননা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন——নিরাকার ভাবনা করা কঠিন, সমালোচক তাহারই বাহবা দিয়া বলিতেছেন —"উপাসনা যত উচ্চ অঙ্গের হইবে, ততই কঠিন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্থাৎ রামপ্রসাদ অধম উপাসক ছিলেন তাই তাঁহার এ দশা; আর অর্থাৎ কেন? সমালোকের দল স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে "এক্ষণে কেবল এই আক্ষেপ হয় যে, রামপ্রসাদের যদি প্রথম হইতেই প্রকৃত পথে (নিরাকার পথে) সাধনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে না জানি রামপ্রসাদ আরও কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেন (সমালোচক যেমন করিয়াছেন)। আ মরি মরি। যেমন নিরাকার মন্দিরের সৌন্দর্য্য, তেমনি নিরাকার সোপানের শোভা!! রামপ্রসাদের সে সৌভাগ্য ঘটিবে কোথা হইতে? তিনি যে সময়ে সংসারে আসিয়া ছিলেন, তখনও যে এ মণির খনি কেহ অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসে নাই—— সমালোচক! মুহূর্ত্তের জন্য জঘন্য নারকীয় বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একটু স্থির হইয়া বসিতে পার কি? তোমাকে দুই একটা কাযের কথা জিজ্ঞাসা করিব। রামপ্রসাদ যে বলিয়াছেন——"কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার" ইহা কোন্ অধিকারের কথা? আর ইহার অর্থ কি? তাহা বুঝিবার শক্তি সামর্থ্য বা অধিকার তোমাদের আছে কি? তোমরা রামপ্রসাদের গানগুলিতে যে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ, তাহা বলিবার নহে— আমরা একে একে তর্জ্জনীনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইব যে, ধর্ম্মজগতে এরূপ অনধিকার মতপ্রচার, প্রচ্ছন্ন দস্যুবৃত্তি, ইহা নিঃসন্দেহ!!

"ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব। কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার। গুণভেদে গুণময়ি! হয়েছ সাকার॥"

এ কথাগুলি তুমি বুঝিয়াছ কি? যদি বুঝিতে, তাহা হইলে আর এ সর্ব্বনাশ ঘটাইতে না। ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব, কালীমূর্ত্তিধ্যানে মহা-

যোগী সদাশিব, এ কথা বুঝিতে হইলে গুরুর নিকটে যথাশাস্ত্র দীক্ষিত এবং উপদিষ্ট হইবার প্রয়োজন। পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার, কিন্তু, যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার, এই দুই পয়ারের মধ্যে যে "কিন্তু"টি আছে, এ "কিন্তু"টি বুঝিতে কিন্তু তোমার এখনও অনেক যুগ যুগান্তের প্রয়োজন। এ নিরাকার, ঊনবিংশ শতাব্দীর কিম্ভূত কিমাকার নিরাকার নহে —ইহা রূপ-নিরাকার, এইটুকু সূত্র; তাহারই বৃত্তিতে বলিতেছেন — আকার তোমার নাই অক্ষর আকার—তাহারই ভাষ্য কেবল "গুণভেদে গুণময়ি! হয়েছ সাকার" বিশেষ সাধনালব্ধ শক্তি ব্যতীত এ গভীর অলৌকিক তত্ত্ব বুঝিবার নহে। বড়ই হাসির কথা যে, তুমি অদীক্ষিত হইয়া মন্ত্রশক্তির লীলা খেলা বিচার করিতে যাও, ইহারই নাম গর্ভস্থ শিশুর সংগ্রাম সাধনা!!!

সমালোচক! তুমি যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত না হইয়া যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইতে তাহা হইলেই আমাদের এ দুঃখ ঘুচাইবার উপায় ছিল, নতুবা মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। স্বয়ং বিশ্বনাথের শ্রীমুখের আজ্ঞা অনধিকারীর নিকটে এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নহে——তাই রামপ্রসাদের গান সূত্ররূপ হইলেও আমরা তাহার বৃত্তিভাষ্য টীকা হাটে ঘাটে মাঠে ছড়াইতে পারিতেছি না। তবে তোমাকে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, যে সকল সাধনাসাধ্য তত্ত্বের সাধনা অতীত সহস্র মস্তিষ্ক বিলোড়নেও উপলব্ধি হইবার নহে, সাধনার অনধিকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধক-জগতে হাস্যাস্পদ হইয়া মূর্খমণ্ডলীর এ সর্ব্বনাশ কর কেন? রামপ্রসাদ পরমার্থসাধক, আর সমালোচক স্বার্থসাধক, এই অমৃত আর বিষ, স্বর্গ আর নরক, তুমি একত্র মিশাইতে চাও কোন্ সাহসে? তুমি আবরণ দিয়া আক্ষেপ করিয়াছ যে, "রামপ্রসাদের যদি প্রথম হইতেই প্রকৃতপথে সাধনার স্রোতঃ প্রবাহিত হইত!" কি আন্তরিক দাম্ভিকতা! তুমি কি দর্পণ দেখিয়া মনে করিয়াছ যে, রামপ্রসাদ দিশাহারা উন্মার্গগামী শাস্ত্রাধিকারবিবর্জ্জিত অদীক্ষিত জন্মান্ধ জীব? রামপ্রসাদের রামবিক্রয়ী উচ্ছিষ্ট

ন্যাস হইয়া তুমি রামপ্রসাদকে সাধনার প্রকৃত পথ দেখাইতে চাও—— এত আস্পর্দ্ধা কিসে তোমার? তুমি সংসারে বসিয়া আপন জীবিকার পথ দেখিতেছ, তাহাই দেখ—শাস্ত্রের নিগূঢ়গর্ভ নিহিত সাধনাতত্ত্ব ধরিয়া এ টানাটানি রোগ, এ অনধিকার প্রবেশ তোমার কেন? তোমাকে নিরাকার-রোগে ধরিয়াছে তুমি আকাশে লম্ফ দাও, রামপ্রসাদের তাহা ধরে নাই বলিয়া এ আস্ফালন কেন? তোমাদের সাধন ভজনের সার-সিদ্ধান্ত যেমন সাকারবিদ্বেষ, রামপ্রসাদের সাধন ভজনের শেষ সিদ্ধান্ত তদ্রূপ নিরাকারবিদ্বেষ ছিল না। রামপ্রসাদ কেন? আর্য্যশাস্ত্রের আজ্ঞা-নুবর্ত্তী কোন সাধকেরই তাহা থাকিতে পারে না—তাঁহারা নিরাকারতত্ত্ব বুঝিয়াই বলিয়া থাকেন, নিরাকারের সাধন ভজন অসম্ভব, আর, যাহারা নিরাকারের না[illegible]াই "দিল্লীকা লাড্ডু" করিয়া বুঝিয়া বসিয়া আছে, তাহারাই আকা[illegible]া নিরাকারপূজার জন্য চিৎকার করিয়া বেড়ায়। এই জন্যই শ্রে[illegible] বলিয়াছেন "যাহারা বলে আমরা ব্রহ্মকে জানি, তাহাদিগের [illegible] তিনি অজ্ঞাত এবং যাহারা বলে ব্রহ্মকে জানিতে পারিলাম না, তাহাদিগের পক্ষেই তিনি বিজ্ঞাত" নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে তাঁহার স্বরূপ নির্বাচন হয় না বলিয়াই তিনি অনির্ব্বচনীয়। বস্তুতঃ সাকারের নাম শুনিলে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্বজাধারী সম্প্রদায় যেমন ভয় পান, ব্রহ্ম কিন্তু তেমন ভয় পান না বলিয়াই সাকার-উপাসকগণের অন্তঃকরণে নিরাকারবিদ্বেষ স্থান পায় না। যাহা হউক, রামপ্রসাদ নিরা-কার উপাসক ছিলেন, কি সাকার উপাসক ছিলেন, তাহা লইয়া আর আমরা "আদার ব্যাপারীর মুখে জাহাজের কথা" শুনিতে চাই না। রামপ্রসাদ, আমেরিকা আফেরিকা ইয়ুরোপের লোক নহেন, বঙ্গভূমিতেই তাঁহার জন্ম-মৃত্যু লীলার পর্য্যবসান, আমরাই তাঁহার প্রতিবেশী, শুনিতে হয়, দেশের লোকে বিদেশের লোকে আমাদের নিকটেই তাঁহার কথা শুনিতে আসিবে। আমরা কাহারও নিকটে তাঁহার কথা শুনিতে যাইব না। সাপ্তাহিক সম্প্রদায়ের মত দল বাঁধিয়া সুর বাজাইয়া গান করাই রামপ্রসাদের মুখ্য

সাধনা ছিল না। গভীর সাধনা-সাগরে তিনি ডুবিয়াছিলেন, আগমবদ্ধ সাধনা হইতে যখন ক্ষণিক বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার ভাবের হিল্লোলে দুই একটী করিয়া গানের তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, সেই তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়াই আজ সমালোচক দলের এ দুর্গতি। রামপ্রসাদের শবসাধন, চিতাসাধন, শক্তিসাধন, মহাশঙ্খের মালা, বিল্বমূল, পঞ্চমুণ্ড প্রভৃতি আসনের জ্বলন্ত প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান। রামপ্রসাদ যে অধিকারে অধিকারী— যে তত্ত্বে উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক, সাধক সম্প্রদায়ে এখনও তাহা গভীর ভেরীরবে বিঘোষিত হইতেছে, বাহিরের দুই একটা ভাষা গান শুনিয়াই যদি বাজে লোকে তাহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে ত হাজার হাজার সমালোচক এক দিনেই রামপ্রসাদ হইয়া যাইতেন। গুরু তাঁহার পথপ্রদর্শক, শাস্ত্র তাঁহার স্বয়ং প্রদীপ, গন্তব্য তাঁহার সাধনাপথ, প্রা[illegible]হার জগদম্বার চিন্তামণিধাম। প্রতি কার্য্যে তাঁহার যেমন শিরা[illegible]রণ করা ছিল, শিবের দোহাই দেওয়া ছিল—গানেও তাঁহার তা[illegible]হইয়াছে — শিবের আজ্ঞা অনুসারে কার্য্যসাধনা যে না করে, সেও কি কখন বুকের পাটায় বল করিয়া শিবের দোহাই দিতে পারে? শিব মানি না, শাস্ত্র মানি না, গুরু মানি না, সাধনা মানি না, সাধ্য দেবতা মানি না, অথচ রামপ্রসাদকে আর তাঁর গুড়-ভাঁজান গানগুলিকে মানি। দেবতাকে মানি না, অথচ ভূত ভাবিয়া ভয়ে মরি; গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা এ বিদ্যা রামপ্রসাদের ছিল না। তিনি অবনতমস্তকে শাস্ত্রের দাস হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই শাস্ত্রানুসারে অলৌকিক, সিদ্ধিশক্তি তাঁহার নিত্যসহচরী হইয়াছেন॥

রামপ্রসাদের আর একটী গানে আছে ———

মন্! তোমার এই ভ্রম গেল না—
কালী কেমন তা চেয়ে দেখ্‌লে না।
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জান না?
তুমি, মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে কর্‌তে চাও রে উপাসনা॥

ত্রিজগৎ সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
তুমি, সেই মাকে সাজাতে চাও রে দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত খাদ্য নানা।
তুমি কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তাঁয় আলোচাল আর বুঁট ভিজানা ॥
ইত্যাদি।

"অতদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রমঃ" যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে তৎপ্রকারক জ্ঞান হইলেই তাহার নাম হয় "ভ্রম"। স্বরূপজ্ঞানের অভাবের নামই অজ্ঞান বা ভ্রম. যে যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝাই ভ্রম, স্বরূপজ্ঞানের অভাবেরই নামান্তর ভ্রম। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে বিরুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃই বিদূরিত হয়। লোকরাজ্যে এই কথাই সুপ্রসিদ্ধ যে,—যতক্ষণ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই ভ্রম থাকে, বুঝিলেই ভ্রম ঘুচিয়া যায়; কিন্তু "মন! তোমার এই ভ্রম গেল না" এ কথা যিনি বলিতেছেন—তিনি ত বুঝিতেছেন যে, ইহা তাঁহার মনের ভ্রম, তবে "ভ্রম গেল না" বলিয়া তিনি এ আক্ষেপ করেন কেন? বুঝিলেই ভ্রম ঘুচিয়া যাইবার কথা, কিন্তু বুঝিয়া শুঝিয়া মনে মুখে এক করিয়া বলিতেছেন, তথাপি তাঁহার ভ্রম ঘুচিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ— এখন সমালোচক বুঝিয়া লউন এ ভ্রম কেমন ভ্রম! তুমি আমি যেমন "সাকার উপাসক বলিয়া পরকে টিট্‌কারী দিয়া বেড়াই, রামপ্রসাদ তাহা দেন নাই—তিনি পর সাবধান করিবার পূর্ব্বে ঘর সাবধান করিয়া নিজেই নিজের মনকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"মন্ তোমার এই ভ্রম গেল না" আর আমরা হইলে হয় ত বড় অনুগ্রহ করিলেও বলিয়া ফেলিতাম— ভাই! তোমার এই ভ্রম গেল না, অর্থাৎ আমার গিয়াছে, তোমা অপেক্ষা আমি অনেক বড় লোক। করুণাময়ীর পরম করুণাভাজন মহাত্মা দিগম্বর যে ভ্রান্তির মূল স্পর্শ করিয়া ধীর গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, "ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।" অমূলস্পর্শী রামপ্রসাদ সাধনার প্রথমাধিকারে সে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অশান্তহৃদয়ে অধীর হইয়া বলিতেছেন —"মন

তোমার এই ভ্রম গেল না"। যে ভ্রমকে অতি সন্তর্পণে অন্তঃকরণের অন্তঃস্তরে পোষণ করিয়া দিগম্বর জগদম্বার লীলানন্দ অনুভব করিতেছেন, রামপ্রসাদ অন্তঃকরণ হইতে সেই ভ্রমকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—ইহা কেবল অপক্ক সাধনার চাঞ্চল্য মাত্র। এই চাঞ্চল্য এক দিন হইয়াছিল বলিয়াই রামপ্রসাদ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেন, ইহা কেহ মনে করিবেন না, কেন না উত্থান যেখানে সম্ভব, পতনও সেই খানে, পতন যেখানে সম্ভবে, উত্থানও সেই খানে। তবে কেহ কেহ রামপ্রসাদের নাম শুনিলেই তাঁহাকে জন্মযোগী বা জন্মান্তর-সিদ্ধ মনে করিয়া ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, মনে করেন রামপ্রসাদই সাধকরাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা, আমরা তাহা মনে করিতে পারি না—কারণ, আমরা প্রথমে রামপ্রসাদের মুখে (গানে)ই তাঁহার নিজের কথা শুনি, তার পর সাধকসম্প্রদায়ে প্রচারিত তাঁহার সাধনা বৃত্তান্তে তাহার প্রমাণ অবগত হই, তার পর শাস্ত্রের কষ্টিতে তাঁহার কথা কষিয়া মাজিয়া বুঝিয়া লই—মহা মহা রামপ্রসাদের কথাও যদি শাস্ত্রবিগর্হিত হয়, তবে তাহা উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ দূরে পরিহার করি। কারণ, যাঁহার প্রসাদে রামপ্রসাদ সপ্রমাণ, তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলে কোটি কোটি রামপ্রসাদ তখন কীটাণুকীট বলিয়াও গণ্য নহেন। উল্লিখিত গানটি যে রামপ্রসাদের অতি অপক্কাবস্থার, আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি—এখন প্রথমতঃ এইটুকু বুঝিবার কথা যে, যে সময়ে রামপ্রসাদের এই গান, সে সময়ে তিনি জ্ঞানরাজ্যের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যস্তরে অবতীর্ণ, শেষ স্তরে অপ্রবিষ্ট এবং সাধনা রাজ্যে নবপ্রবিষ্ট মাত্র; তাই ভক্তিতত্ত্ব-নিরপেক্ষ কেবল জ্ঞানের সহিত সাধনাকে সম্মিলিত করিতে গিয়াই উপক্রম উপসংহার স্থির রাখিতে পারেন নাই। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জাননা" এ টুকু সম্পূর্ণ জ্ঞানরাজ্যের কথা। কিন্তু "তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তাঁরে করুতে চাও রে উপাসনা" এই টুকু সাধনতত্ত্বে—ব্যাকুল অবস্থা। ত্রিভুবনের সমস্তই যদি মায়ের মূর্ত্তি হইল——তবে মাটীর মূর্ত্তি গড়িলে যে তাহা

মায়ের মূর্ত্তি হইবে না, ইহা কে বলিল? জ্ঞানদৃষ্টিতে ত্রিভুবনকে মায়ের মূর্ত্তি বলিলেই মাটীর মূর্ত্তিও যে তাঁহার মূর্ত্তি, ইহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ, এ কথায় রামপ্রসাদ শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধাচারী হইয়া মাটীর মূর্ত্তি গড়িতে নিষেধ করিতেছেন তাহা নহে, "মা ত্রিভুবনময়ী হইলেও তাঁহাকে সেই বিশ্বব্যাপিনীরূপে দেখিতে পারিতেছি না বলিয়াই আজ মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া পৃথক্ ভাবে পূজা করিতে হইতেছে"——এই দুঃখই গাহিয়াছেন; সাধনার চরমাবস্থা——সিদ্ধির প্রাকাল পর্য্যন্ত কে-ই বা এ দুঃখ না গাহিয়া থাকেন? এই দুঃখের অবসান করিবার জন্যই ত তাঁহার উপাসনা, সে দুঃখ যদি আগেই ঘুচিয়া গেল, আগেই যদি মাকে জগন্ময়ী দেখিলাম, তবে আর উপাসনা কিসের জন্য? যাঁহারা সেই জগন্ময় মা না দেখিয়া জগন্ময় মাটিই দেখেন, অথচ রামপ্রসাদের ধুয়া ধরিয়া বলিয়া বেড়ান "মন তোমার এই ভ্রম গেল না" তাঁহারা যে কোন্ অধিকারের অধিকারী, তাহা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। "জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা। তুমি, সেই মাকে সাজাইতে চাওরে দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥" এ কথাটী আবার—ভক্তিরাজ্যের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার আভাসমাত্র। কত কত স্বর্ণরত্ন দিয়া যে মা জগৎকে সাজাইতেছেন, সেই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরীকে তুমি তুচ্ছ ডাকের গহনা দিয়া সাজাইতে চাও, ইহা বড়ই বিড়ম্বনার কথা! এতাবতা মাকে সাজান যায় না, বা মা সাজেন না, ইহা ত প্রতিপন্ন হইতেছে না, বরং সাজাইতে পারিলে মা বিলক্ষণ সাজিতে পারেন, ইহাই সপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি ত্রিভুবন-সৌন্দর্য্যসজ্জার নিদানভূমি, তৃণবৎতুচ্ছ ডাকের গহনা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের নিকটে উপস্থিত করাই বিষম ধৃষ্টতার কথা। অনন্ত কোটি কুবেরের অক্ষয় রত্নভাণ্ডার যাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিলেও সূর্য্যমণ্ডল-সম্মুখে প্রদীপ-বর্ত্তিকার ন্যায় তাহার আত্ম-অস্তিত্ব হারাইয়া যায়, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ডাকের গহনা, এ কথা মনে করিতেও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়, এই অপূরণীয় অভাবের যাতনায় অধীর হইয়াই রামপ্রসাদ বলি-

য়াছেন—তুমি সেই মাকে সাজাইতে চাও রে, দিয়ে ছার ডাকের গহনা। তথাপি শাস্ত্র তাঁহাকে সাজাইবার ব্যবস্থা কেন দিয়াছেন, সে কথার উত্তর আমরা পরে করিব, তবে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, সাধনা করিতে হইলেই মাকে সাজাইয়া সাধ মিটাইতে হইবে, ইহা সাধক সাধিকার দায়িত্ব বিশেষ। সাধনারসে হৃদয় নিমগ্ন হইলে সে রসতত্ত্ব তখন জগদম্বার ব্রহ্মতত্ত্বকেও অভিভূত করিয়া ফেলে, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, সাধকের সে অপরাজিত পরাক্রমকে পরাজিত করিতে স্বয়ং অপরাজিতাও অনেক সময়ে কাতরতার অভিনয় করিয়া থাকেন। ভবজননীর সেই ভক্তবৎসল লীলামাধুর্য্যে ডুবিয়াই ভাবচাতুর্য্যচূড়ামণি দাশরথি "আগমনী" প্রবন্ধে জগজ্জননীর জননীর প্রেমে দেখাইয়াছেন—ভক্তরাজ গিরিরাজের দুর্গোৎসব-সাধনার অনুরোধে নগেন্দ্রনন্দিনী যখন মহিষমর্দ্দিনী সাজিয়া শুভ ষষ্ঠীর সায়ংকালে শৈলরাজের মণ্ডপপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, উমা-ময়জীবনা শৈলরাজমহিষী মেনকা, উমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রাঙ্গনে আসিয়া রণরঙ্গিনীমূর্ত্তিদর্শনে ভীত চকিত হইয়া কন্যা-তত্ত্বের মহাসাধিকা অন্য তত্ত্বে যখন দিশাহারা হইয়াছেন, তখনই—

"মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব্বরূপ পূর্ব্বের তনয়া॥
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥
দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতে যদারা।
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা॥
উমাচন্দ্র কোটীচন্দ্র-জিনি রূপ ধরে।
দশ চাঁদ পড়িয়ে মায়ের চরণনখরে॥
হেরিয়ে গগণচাঁদ মলিন লজ্জায়।
চাঁদে কি তুলনা তাঁর, চাঁদ পড়ে যাঁর পায়॥

শরদে, শারদচাঁদের হাট হৈল হিমালয়ে।
রাণী পাইল হাতে চাঁদ, উমাচাঁদকে পেয়ে।।
চাঁদের পরিবার উমার, গণচাঁদকে ঢাকে।
চন্দ্রমুখী চাঁদমুখে জননী ব'লে ডাকে ॥
রাণী বলে এলি আমার দুর্গা দুঃখহরা।
রোদনে রোদনে তারা! নাই মা নয়নতারা।।
বিদায় দিয়ে কি দায় উমা। ঘটে গৃহবাসে।
আমার, দেহ থাকে মা! হিমালয়ে প্রাণ থাকে কৈলাসে ॥
অদর্শনে ধরাসনে মৃতসমা রই।
আজ, প্রাণ এনে দেহেতে দিলি তাই ত কথা কই ॥
"মা আছে" মা। ব'লে মনে হয় না কিসের লাগি।
তোর শোকে মা ম'লে হবি মাতৃবধের ভাগী।।
আমি, পুত্রহীনা কন্যাবিনা অন্য গতি কৈ?
তোর ভরসা তোরই আশা করি ব্রহ্মময়ি।।
কোন্ দিনে ত্যজিব প্রাণ, দিনে দিনে জরা।
অসমর্থকালে তত্ত্ব কর্‌বি না কি তারা?
তোর, ভাব দেখে ভবতারিণি! শঙ্কা মনে আছে।
হাঁ মা! অন্তকালে আনুতে গেলে আস্‌বি না কি পাছে? ॥ *
রাণীবাক্যে মনোদুঃখে কন শিবরাণী।
তুমি গো আমার তত্ত্ব কর কৈ? জননি!
জনক যাহার রাজা, মা যার রাজমহিষী।
ভাগ্যগুণে পতি না হয়, হয়েছেন সন্ন্যাসী।।
নারীগণের গঞ্জনাতে লজ্জায় ম'রে যাই।
বলে, রাজার মেয়ে শুনুতে পাই, তোর কি গো মা নাই?

---

* ধন্য ধন্য ভক্তকবি দাশরথি! যথার্থ সময় বুঝিয়া আনিবার অধিবাস তুমিই করিয়াছ!! ইহাকেই বলে——"যা লোকদ্বয়সাধিনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"

জনক পাষাণ। তেমনি মা তুমি পাষাণী।
আমি, পাশরিতে নারি মায়া তাই আসি আপনি॥
রাণী বলে ঈশানি! পাষাণী বটি আমি।
পাষাণ হওয়া ভাল মা! তায়, যার কন্যা তুমি॥ ‡

× × + × +

এত বলি গিরিভার্য্যা ভাসে নয়নজলে।
করুণা করিয়ে পুনঃ কন্যাপ্রতি বলে॥
অচলপতি গতিহীন কিরূপে তত্ত্ব করি?
পূরাও গো সাধ, সে অপরাধ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করি॥
কত লোকে, উমা! আমাকে, তোমায় দুঃখী বলে।
শুনে শুনে, মনাগুণে, সদা প্রাণ জ্বলে॥
বলে, স্বর্ণলতা, বিবর্ণতা, রাণি! তোর কুমারী।
করি ভিক্ষা, প্রাণরক্ষা, করেন ত্রিপুরারি॥
সবে ধন, উমাধন, আরাধনের ধন।
রাখিতে চাই, ঘরজামাই, মানেন না ত্রিলোচন॥
তখন, মেনকারে, দর্প ক'রে, দুর্গা কন ছলে।
তোর জামাতার দুঃখের কথা, কেবা তোরে বলে?॥
মোর ভর্ত্তা, হর্ত্তা কর্ত্তা, ত্রিভুবনস্বামী।
বরং, মা তুমি দরিদ্রজায়া, রাজমহিষী আমি॥
কান্ত আমার, কাশীকান্ত, * অন্ত কে তাঁর জানে।
জগতে ধনী, ওগো জননি! আমার পতির ধনে॥
ভক্তি করি, মোর পতিকে যে জন করে ভিক্ষে।
মোক্ষধন, ত্রিলোচন, তারে দেন কটাক্ষে॥

---

‡ পাষাণ না হইলে তোমায় অদর্শন যাতনা সহিবে কি রূপে?

* অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও জ্যোতির্ময়ী কাশীর গৌরব সমধিক, তাই অন্য ভুবনেশ্বর পরমেশ্বর প্রভৃতি বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়াও কাশীকান্ত বিশেষণে কালীকান্তের পরিচয় সূত্র; ইহারই বৃত্তি——"কাশীতে রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।"

নাই, কিছুরই অভাব, দেখিতে স্বভাব, দীনদুঃখীর প্রায়।
যে বুঝে ভাব, তার উঠে ভাব, ভবের ভাবনা যায়॥
তোর ধনে কি, তোর জামাই কি, সম্পত্তি পাবে?
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী এনে, তারে ধন দিবে?
তার কখন দৈন্য থাকে? যার ঘরে তোর মেয়ে।
জগতে অন্ন যোগাই আমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে॥
রত্নাকর কুবেরাদি শিবের ধন রাখে।
কত পুণ্যে, মা তুই কন্যে, সঁপেছিলি তাঁকে॥
আমি, ইন্দ্রাণী তোর্ ক'র্তে পারি এমনি পতির জোর।
দশপুত্রসমা কন্যা, আমি কন্যা তোর॥
যত, প্রতিবেশী হিংসক, সুখ তোরে বলে না।
দুঃখের কথা, ব'লে মাতা! দেয় তোরে বেদনা॥
রাণী বলে মর্ম্মকথা বল ব্রহ্মময়ি!
এত যে ঐশ্বর্য্য তার বাহ্যলক্ষণ কৈ?
সাজাইতে শঙ্করি! তোরে, সাধ কি শিবের নাই?
রত্ন-আভরণ কেন দিলেন না জামাই?॥
উমা-বিধুর, অঙ্গ শুধু, কি করে চার ধনে।
এলে, দৈন্য সাজে, পদব্রজে, সন্দেহ হয় মনে॥
মেনকারে হাস্যমুখে, উমা কন রঙ্গে।
ওমা ——! আভরণ, ত্রিলোচন, দেখিতে নারেন অঙ্গে॥
বলেন, এ অঙ্গ সাজাতে কি ভূষণ, আছে এ ভুবন মাঝে।
তারিণী আমার শিরোমণি, মণি কি তোমায় সাজে?॥
চাঁদে কি বাঁধিলে মণি, অধিক উজ্জ্বল করে?
আমার, শূন্য বেশে আশুতোষের সদা মন্ হরে॥
পঞ্চাননের বাঞ্ছা মনে যা হয়, তাই করি।
নইলে, অসংখ্য অমূল্য মণি যায় গড়াগড়ি॥

রাণী বলে কেন ভূষণ সাজিবে না গায় ?
হ'লে, হস্তিদন্ত স্বর্ণে বাঁধা অধিক শোভা পায় ॥
আমি প্রত্যক্ষে দেখিব আজি নানা রত্ন আনি।
সাজে কি না সাজে অঙ্গ তোমার ঈশানি।

+ + × × +

তখন, প্রেমানন্দে গিরিরাণী, রত্ন-আভরণ আনি,
উমা-রত্নে যত্নে সাজাইল।
কদাচ না শোভা পায়, আভরণ উমার গায়,
চাঁদকে যেমন রাহুতে গ্রাসিল ॥
খেদে রাণী ম্রিয়মাণা দাসীগণে করে মানা,
বলে, আর এনো না তুচ্ছ আভরণ।
যা দিয়ে সাজালাম দেহ, শীঘ্র মুক্ত করি দে'হ,
মায়ের, শূন্য দেহ করি দরশন ॥

—*—

সাজিল না শঙ্করি মা! তোরে আভরণে সাজিল না।
কোন্ বিধি গড়িল মা তোর হরঅঙ্গনা ॥
কি রূপ ধ'রেছ তারা, শরচ্চন্দ্রমুখি তারা! মা আমি, চাঁদের নাম রেখেছি তারা, নয়নতারা ছিল না ॥
রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে, মা উমা! তাইতে বুঝি ত্রিনয়ন তোরে, নয়ন ছাড়া করে না ॥

—*—

এইরূপে তাঁহাকে সাজাইবার সাধ যতক্ষণ না মিটিয়া যাইতেছে, ততক্ষণ সাধনা চরিতার্থ হইবার নহে, তাই শাস্ত্র তাঁহাকে সাজাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাকে সাজাইতে গিয়া আমাকে বারংবার এইরূপে শ্রান্ত ক্লান্ত লজ্জিত বিড়ম্বনাগ্রস্ত দেখিয়া সন্তানের সন্তাপ দূর করিবার জন্য করুণাময়ী ত্রিপুরসুন্দরী যে দিন আপন সৌন্দর্য্যে আপনি সাজিয়া

আপনি আসিয়া এ হৃদয়সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন, আমার অলঙ্কারে মাকে সাজাইতে গিয়া, যে দিন মায়ের অলঙ্কারে আমি সাজিয়া দাঁড়াইব, সেই দিন আমার সাজাইবার সাধ জন্মের মত মিটিয়া যাইবে — সেই দিন আমি আনন্দে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জগৎকে ডাকিয়া দেখাইব — মাকে যে সাজাইতে যায়, সে তাঁহাকে সাজাইতে না পারিলেও, সাজাইতে গিয়াছিল, এই পুণ্যফলেই আপনি সাজিয়া দাঁড়ায়। সে সাজ সজ্জার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভব করিতে হইলে কোন্ চক্ষুর প্রয়োজন, তাহাও রামপ্রসাদ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে তাহা দেখাইতে সচেষ্ট হইব ; এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিবার কথা যে, মায়ের উপযুক্ত হউক বা না হউক, আমার অবস্থার উপযুক্ত হইলেই মাকে আমি সাজাইব ! কেননা, মা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও মা, আমারও মা। উমার উপযুক্ত হউক বা না হউক, মেনকার উপযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই মায়ের মা মাকে সাজাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত অলঙ্কারকে তিনি মায়ের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অলঙ্কারে (অহঙ্কারে) মা সাজিলেন না, কিন্তু মায়ের অলঙ্কারে তিনি সাজিয়া দাঁড়াইলেন, ব্রহ্মময়ী উমার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যসাগরে মেনকার দৈবসৌন্দর্য্য ডুবিয়া গেল, আত্ম-অস্তিত্বের অহঙ্কার-অন্ধকারময় অলঙ্কারকে বিদূরিত করিয়া একমাত্র জগদম্বার সত্তাসৌন্দর্য্য-সূর্য্যকিরণে মেনকা স্বয়ং প্রতিভাশালিনী হইলেন, তখনই চিন্ময়ীর স্বপ্রকাশ স্বরূপ দর্শন করিয়া বলিলেন " ওরে, আর এন না তুচ্ছ আভরণ—এখন, যা দিয়ে সাজালাম দেহ, শীঘ্র মুক্ত করি দেহ, মায়ের শূন্য দহ করি দরশন " মায়ের সাধ এবং সাধনা মিটাইবার জন্য মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল হইতে শ্রীচরণাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যখন নিষ্কল সচ্চিদানন্দ মাধুরীধারা বিগলিত হইয়া পড়িতেছে, তখন সে লাবণ্যে অন্য শোভা স্থান পাইবার নহে, তাই মেনকা সাধ মিটাইয়া সাধ করিয়া বলিতেছেন— —মায়ের শূন্যদেহ করি দরশন——কেননা ; কন্যা তখন লীলারূপে কন্যা হইলেও কৈবল্যরূপে পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।

রামপ্রসাদের হৃদয়ের যেরূপ ঊর্দ্ধগতি, তাহাতে সেই সাধ মিটাইবার উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ব্যথিত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন——তুমি সেই মাকে সাজাইতে চাও রে দিয়ে ছার ডাকের গহনা এতাবতা, "মাকে সাজাইতে হইবে না" ইহা তাৎপর্য্য নহে, মাকে সাজাইবার উপযুক্ত অলঙ্কার পাইলাম না, ইহাই তাঁহার দুঃখ গীতি—অন্যথা মাকে মা বলিয়া ডাকিতে সাধ আছে, অথচ তাঁহাকে সাজাইতে সাধ নাই, এমন দুর্ভাগ্য সন্তান জগতে কে আছে ?

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা,
তুমি কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাও তাঁয় আলোচাল্ আর বুঁট ভিজানা।"

যিনি সাজাইতে পারেন, তিনি সাজিতেও পারেন, যিনি খাওয়াইতে পারেন, তিনি খাইতেও পারেন। সাজাইবার সাধ যাঁহার আছে, সাজিবার সাধ থাকা তাঁহার অসম্ভব নহে, খাওয়াইবার সাধ যাঁহার আছে, খাইবার সাধ থাকাও তাঁহার অসম্ভব নহে। হয় একেবারে বল, তিনি সাজানও না, সাজেনও না ; খাওয়ানও না, খানও না ; আর না হয়, একেবারে বল, তিনি সাজানও, সাজেনও ; খাওয়ানও, খানও। সাকারমূর্ত্তিতে তিনি না-ই বা সাজিলেন, কিন্তু তোমার নিরাকারমূর্ত্তিতেও ত সাজাইলেন ইহা সত্য, তবে আর তুমি অব্যাহতি পাইলে কিসে ? নিরাকারস্বরূপ, নিত্যনির্গুণ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ; সেই নির্গুণস্বরূপে জগৎকে সাজাইবার-ইচ্ছারূপগুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। তবে——ঊনবিংশ শতাব্দীর কল্যাণে আজ্ কাল্ অনেক স্থানে সগুণ নিরাকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়. আমরা কিন্তু সে গুণকে নিরাকারের গুণ না বুঝিয়া নিরাকার-উপাসকগণের গুণ বলিয়া ই বুঝিয়াছি, অন্যথা নির্গুণব্রহ্মে গুণস্বীকার আর আকাশের প্রমদবনে কুসুমচয়ন একই কথা। যাঁহারা ব্রহ্মকে গুণলেশ-বিবর্জ্জিত বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা আবার গুণময় ব্রহ্মাণ্ডের জন্য ত্রিগুণময়ী মায়ার স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন ; ইঁহারা কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণময় জগৎকেও অস্বীকার করিতে পারেন না। মায়ার

স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে সে গুরুগম্ভীর চিন্তার ভারকেও সহিতে পারেন না, আবার জগতের সহিত নিরাকার ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বলিলে তাঁহাকে "দয়াল পিতা" বলিয়াও ডাকা ঘটে না, আবার সম্পূর্ণ সগুণ বলিলেও সাকার-উপাসকগণের নিকটে লজ্জায় মুখ দেখান কঠিন হইয়া উঠে, কারণ সগুণ হইলেই সাকার হইবার কথা, তবেই ত বিষম বিপদ্, তাই ইহাঁরা সম্পূর্ণ সগুণ (যে টুকুতে সাকার হইবার কথা) বাধ দিয়া আধা সগুণ, আধা নির্গুণ, নিরাকার অথচ সগুণ, সগুণ অথচ নিরাকার—এই এক কিম্ভূত কিমাকার ব্রহ্মের অবতারণা করিয়া থাকেন, ইনি শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দ বাইবেল হইতে দয়াল পিতা, কোরাণ হইতে কর্ত্তা ঈশ্বর, অনার্য্যগণের আর্য্যবিদ্বেষ হইতে নিরাকার, আর স্বার্থসিদ্ধি হইতে সাময়িক প্রেমময়। আর্য্যগণের উপাস্যদেবতার সহিত ইহাঁকে এক হইতে দেওয়া হইবে না, এ জন্য তিনি নাম রূপের অতীত হইলেও তাঁহার রূপ নাই, কিন্তু নাম আছে—কেননা কেবল "হে" বলিয়া ডাকি কি করিয়া? যাহা হউক এই নব আবিষ্কৃত সগুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁহাদিগের কায চালাইবার উপযুক্ত হইলে ও আমাদিগের এমন কোন অভাব উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে এ অভিনব-অবতারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, নিরাকার হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের ই আমরা বড় ধার ধারি, তার ইনি ত সগুণ !!!

সাজাইবার মত যিনি খাওয়াইতে পারেন, তিনি খাইতে পারিবেন না, বা খাইবেন না, ইহাই বা কে বলিল? ইচ্ছাময়ীর নিত্য ইচ্ছা যদি আছে ই আছে, তবে সে ইচ্ছা খাওয়াইতে ও যেরূপ, খাইতে ও সেই রূপ ই। আর যদি বল তাঁহার খাওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে আমরা বলিব তাঁহার খাওয়ানও অসম্ভব; তুমি যখন খাওয়ান স্বীকার করিতেছ, তখন খাওয়া স্বীকার না করিবে কেন? তবে বলিতে পার, তিনি যেন জগৎকে খাওয়াইতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে খাওয়াইবে কে? কেননা, যিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের আহারদাত্রী তাঁহাকে আহার দেওয়া অসম্ভব কথা—শব্দ-

জ্ঞানহতচেতন অতত্ত্বদর্শী সম্প্রদায় এই কথাগুলিকে বড়ই মধুর এবং নিঃশেষ-নিংসারিত সারতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। কারণ এই সকল কথার বাহিরে যে মাদকতা আছে, তাহার মোহ অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে ইহাঁদিগের বুদ্ধিবৃত্তি হৃত এবং কুণ্ঠিত। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন— জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা দিয়ে কত খাদ্য নানা। তুমি কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাও তাঁয় আলো চাল আর বুঁট ভিজানা। এর পর কি আরও কথা আছে! যাহা হইবার তাহা একেবারে এই শেষ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে—(যে হেতু আমার মনের মত) বুঝিয়াছেন মা খান বা খাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু খাওয়াইবেন, কেবল ইহাই সার সত্য !!!

মা জগৎকে খাওয়াইতেছেন, এই জন্য ই যদি তাঁহাকে খাওয়ান না হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ এই দাঁড়ায় যে, মা জগৎকে যত খাও-য়াইতেছেন, আমার নিকট হইতে ই যেন তাহার ষোল আনা শোধ উঠা-ইয়া লইবেন, কেন না জগৎকে যিনি এত খাওয়াইতে পারেন, তাঁহার নিজের আহার কত, তাহাও একবার বুঝিবার কথা। আমি বলি, জগৎকে তিনি যত ইচ্ছা তত খাওয়ান, আমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? আমাকে যাহা খাওয়াইতেছেন, আমি তাহা ই তাঁহাকে দিতে বাধ্য ; ভোগ করি-বার জন্য তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমার সেই ভোগ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি অবসর লইতে পারিলে ই চরিতার্থ ; তাঁহার ষোল-আনা শোধ দিতে আমি আসি নাই, আমার ষোল আনা শোধ দেওয়া পর্য্যন্ত ই আমার দায়িত্ব! আমি যত দিন জীব আছি, তিনি তত দিন ই ব্রহ্ম ; আমি যত দিন সন্তান আছি, তিনি তত দিনই মা ; আমি যত দিন মানব আছি, তিনি তত দিন ই দেবতা ; আমি যত দিন "আমি" আছি, তত দিন ই তাঁহার উপাসনা ; আমার আমিত্ব যে দিন ঘুচিয়া যাইবে, তাঁহার উপাসনাও আমার সেই দিন শেষ হইবে, অথবা তাঁহার উপাসনা যে দিন শেষ হইবে, আমার আমিত্ব ও সেই দিন ই ঘুচিয়া যাইবে। আমাকে যত দিন আলো চাল আর বুঁট

ভিজানা খাইতে হইবে, ততদিন আমি তাঁহাকে তাহা না দিয়া খাই কি বলিয়া? ব্রহ্মাণ্ডের মা হইলেও তিনি যে আমার মা, ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান্ হইলেও তিনি যে আমার প্রভু। আমার—"যদন্নাঃ পুরুষা রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ" যে অন্ন আমাকে ভোগ করিতে হইবে, পিতৃলোক দেবলোক উদ্দেশে ও আমাকে সেই অন্নই দিতে হইবে, যাহা আমাকে আহার করিতে হইবে, আমার ইষ্ট-দেবতা তাহাই প্রসাদ করিয়া দিবেন, তাহাতে যদি "আলো চাল আর বুঁট ভিজানা" বলিয়া তোমার আমার মত তাঁহার অভিমান হইত, তবে কি আর তিনি করুণাময়ী দীনদয়াময়ী প্রপন্নপালিনী ভক্তিসুলভা ভক্তবৎসলা ত্রিভুবনজননী বলিয়া ত্রিজগতের আরাধ্য-দেবতা হইতেন? মহাপ্রেমময়ী মহালক্ষ্মী রুক্মিণীর স্বহস্তসজ্জিত অন্নব্যঞ্জন দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মশাপভয়ভীতা শরণাগতা সাধ্বী সখী দ্রৌপদীর ভোজনাবশিষ্ট স্থালীলগ্ন শাককণা ভোজনের জন্য যদি তিনি দ্বারকা হইতে দ্বৈতবনে ধাবিত না হইতেন, তবে কি তাঁহার গৌরবের "পাণ্ডবসখা" নাম ত্রিজগতে বিঘোষিত হইত? অনন্তভুবনস্বামী বৈকুণ্ঠনাথ হইয়াও যদি প্রহ্লাদের উদ্বেলিত-প্রেমচঞ্চল বালগোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বহস্তে বিষান্নদান-বিমন প্রহ্লাদের হস্ত হইতে অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া নিজকরকমলের অঙ্গুলিদল-প্রসারণে স্বয়ং ব্রহ্মাদিদত্ত-অমৃতপাত্র শ্রীমুখমণ্ডলে তাহা অর্পণ না করিতেন, তবে কি জগতের হরি হইয়াও "প্রহ্লাদের হরি" এই সাধের উপাধি তাঁহার প্রচারিত হইত? দ্বারকায় অষ্টৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও যদি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামার প্রেমসাধিকা-পত্নী-প্রদত্ত তণ্ডুলকণায় সাদরে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া প্রেমের গুণ গাহিতে গাহিতে তাহার অমৃতাধিক মাধুর্য্য আস্বাদন না করিতেন, তবে কি জগতে কেহ তাঁহাকে দীনবন্ধু দয়াময় বলিয়া ডাকিত? গোপবালকের অর্দ্ধভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ফলখণ্ড যদি জীবের চতুর্ব্বর্গফল-বিধাতার নিকটে উপাদেয় বোধ না হইত, তবে কি "সচ্চিদানন্দ" নাম হইতে "নন্দনন্দন" নামের গৌরব এত মাধুর্য্যময় হইত? মহাজ্যোতির্ম্ময় ধাম কৈলাসের

রত্নসিংহাসন পরিহার করিয়া ব্রহ্মাদিজননী মা যদি ব্যাধপুত্র কাল-কেতুর পর্ণকুটীরে রূপের প্রভায় ভবন বন আলোকিত করিয়া অধিষ্ঠিত না হইতেন—গুহগজাননের নিত্যসেবিত শ্রী-অঙ্কে যদি চণ্ডালকুমারকে স্থান দিয়া "চণ্ডী" নাম সার্থক না করিতেন, ব্রহ্মাদিদুর্লভ-পয়োধর দানে কালকেতুকে কৃতার্থ করিয়া কালবনে মোহিনী অন্নপূর্ণা যদি চণ্ডালান্ন গ্রহণ না করিতেন, কালকেতুর কালভয়ভঞ্জিনী যদি ব্যাধের জননী হইতে ঘৃণা-বোধ করিতেন, তবে কি আজ ব্যথিতহৃদয়ে জগতের জীব "মা" বলিতে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইত? সুরথসমাধির সাধ্যদেবতা মা যদি নদীতট বনবিভাগে ফলমূলময় পূজা গ্রহণে সাধকদ্বয়ের হৃদয়বিদীর্ণ-রক্তধারায় সন্তর্পিত হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ না করিতেন, তবে কি মায়ের সাধনায় সাধক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া বদ্ধপরিকরে উদ্যত হইতেন? শাস্ত্রও বলেন, লোকেও বলে——মহারাজ সুরথ এবং মহাসমাধিজীবন বৈশ্যরাজ সমাধি, মৃণ্ময়মূর্ত্তিতে মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎকট তপস্যায় শীঘ্র তাঁহার দর্শনলাভ করিবার জন্য তিন বৎসরকাল নিয়ত খড়্গাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রত্যহ সেই রক্তে মহাপূজার বলিদানকার্য্য সমাধান করিয়াছিলেন—এ কথা শুনিয়া আমার যেন মনে হয় অন্যরূপ—মায়ের পূজার জন্য সন্তানের বক্ষঃস্থল-বিদারণ, এত মায়ের অনুগ্রহের কথা নহে— মা হইয়া মায়ের এ নিদারুণ নিগ্রহ কেন? আমার কিন্তু বোধ হয়, বলিদানে সন্তুষ্ট করিয়া মাকে সম্মুখে আনিবার জন্য সুরথ সমাধি হৃদয়ে খড়্গাঘাত করেন নাই, গুরুদেব মহর্ষি মেধসের মুখে শুনিয়া-ছিলেন, মা নাকি ভক্তহৃদয়বিহারিণী অন্তর্যামিনী, তাই "সন্তুষ্ট করিয়া হউক বা না হউক, অন্ততঃ বিরক্ত করিয়াও তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহি-রের মূর্ত্তিতে আনিয়া দর্শন করিব" এই কঠোর প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্ভর করিয়াই প্রতিনিয়ত হৃদয়ে খড়্গাঘাত করিয়াছেন—নতুবা উৎকট তপস্যা কেন? সে হৃদয় হইতে যে রক্তধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে লোকে তাহাকে হৃদয়রক্ত বলে বলুক, আমি বলি—কেবল হৃদয়রক্ত নহে—

হৃদয় অনুরক্ত -তাই আজ মায়ের ভক্তহৃদয়ে এ রক্তধারা প্রবাহিত ; সে হৃদয় যে, মাতৃপ্রেমে আকণ্ঠপরিপূর্ণ ! তাহাতে যেমন আঘাত হইয়াছে, অমনি দরদরিত প্রেমের ধারা অজস্রনিস্যন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে ! কিন্তু সে প্রেম ত স্বচ্ছ সুন্দর বিশুদ্ধ নির্ম্মল ঘন-নিবিড় দুগ্ধধবল, তাহা কেন রক্তবর্ণ হইল, তাহা বলিব কি করিয়া ? ভক্তগণ ! তোমরাই কেবল বলিয়া দিতে পার, এ রক্ত আসিল কোথা হইতে ? আমার যেন বোধ হয়, ক্ষীরসমুদ্র-মণিদ্বীপ-সিংহাসন-বিলাসিনী মা ভক্তহৃদয়ে ক্ষীরসমুদ্র-সুখশয়নে শয়িতা ছিলেন, সেই ভক্তহৃদয়ে যত আঘাত হইয়াছে, তাহা কেবল ভক্তবৎসলার চরণপীঠেই আহত প্রতিহত হইয়াছে, সেই তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সাদরে সদানন্দের স্বহস্তরচিত জগদম্বার-চরণাম্বুজরঞ্জন উজ্জ্বল অলক্তরসরাগ বিগলিত হইয়া আজ ভক্তহৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগে মিশিয়া গিয়াই লোকনয়নে রক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। নতুবা দেহ ইন্দ্রিয় হৃদয় আত্মা সর্ব্বস্ব যাঁহার চরণে একেবারে সমর্পণ করিয়াছেন—তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য একবার দান করা হয়—আবার বারে বারে দান করা কেন ? সমুদ্র অগাধ হইলেও তরঙ্গময়, প্রেম নিত্যনিবিড় হইলেও নিয়ত চঞ্চল, ইহা তাহার স্বাভাবিকধর্ম্ম। যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, তাহার চরণে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তথাপি দণ্ডে দশবার নিমিষে নিমিষে ইচ্ছা হয়—আবার দেই ! আবার দেই ! ইহা ভালবাসার গুণ কি ভালবাসার পাত্রের গুণ তাহা বলিতে পারি না, ভক্তির গুণ কি মায়ের শ্রীচরণের গুণ তাহা জানি না, ফলতঃ এই গুণের চঞ্চলতায় অধীর হইয়াই সুরথ সমাধি যতবার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন—“আমি জাগিয়া আছি কি না।” ইহা জানাইবার জন্য জগদম্বা ততবারই যেন চঞ্চলচরণ আন্দোলিত করিয়া রক্তের লহরীতে লহরীতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—শেষে, সাধে সাদরে সুরঞ্জিত সব অলক্ত ধুইয়া গেলে পাছে মহেশ্বরের অভিমান হয়—(ভক্তের নিয়ত দত্ত অনুরাগ উপেক্ষা করিয়া বাহিরে দিলে সাধকের মর্ম্মব্যথায় শিববাক্য মিথ্যা হয়) এই ভয়েই নগেন্দ্রকুমারী সে সুখশয্যা হইতে

গাত্রোত্থান করিয়া সাধকের নয়নানন্দদায়িনী মৃন্ময়মূর্ত্তিতে চিন্ময়স্বরূপে জাগিয়া দর্শন দিলেন, যেন এতদিন কিছুই জানেন না, সুপ্তোত্থিত চকিত-বৎ অলস-অবশ ঢলঢল লোচনে অপত্যস্নেহমন্থর মধুরবিলোল প্রশান্তদৃষ্টি-পীযূষবর্ষণে ভক্তহৃদয় সন্তর্পিত করিয়া মৃদুস্মিত-বিম্বাধরে হাসিয়া মা সুরথকে বলিলেন—মহারাজ। যাহা ইচ্ছা কর, তাহা লও। বৈশ্যকেও বলিলেন—কুলনন্দন। যাহা ইচ্ছা তাহা লও——আ মরি মরি! মায়ের মুখে "কুল-নন্দন" এ ত সম্বোধন নয়--অপারস্নেহের কবাট উদ্‌ঘাটন। কেবল মায়ের হইয়া যাহারা মাকেই চায়, মা তাহাদিগকে এমনি করিয়াই মধুরকোমল সম্বো-ধনে মাতাইয়া থাকেন। মহারাজ সুরথ সকামসাধক, অবশ্য পুত্র পরিবার-বর্গকর্ত্তৃক তাড়িত হৃতসর্ব্বস্ব নির্ব্বাসিত হইয়াও তাঁহার অন্তরের সে বিষয়-রসলালসাকাঙ্ক্ষায় বিদূরিত হয় নাই, হৃতরাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাঁহার মায়ের উপাসনা—তাই আজ অন্তর্যামিনী মা রাজপুত্রকে মহারাজ। বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। আর বৈশ্যকুমারের তীব্রবৈরাগ্য সংসারবাসনাকে সমূলে ভস্মসাৎ করিয়া এ মায়ার কেন্দ্রভূমি মহামায়া মাকে না পাইয়া আর শান্ত হইতেছে না---তাই আজ মাতৃপ্রাণ মা-হারা সন্তানকে মা বড় আদরে---বড় সোহাগে "কুলনন্দন" বলিয়া ডাকিতেছেন---সংসারের মা যেমন সন্তানকে কৃতী দেখিলে বড় সোহাগে বলিয়া থাকেন, 'বাছা আমার কুলধুরন্ধর কুলতিলক" মা তেমনি সংসারের অতীতা হইয়াও যেন মায়ের ধর্ম্ম রাখিতে গিয়া মাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়াই বৈশ্যকে বলিয়াছেন "কুল-নন্দন!" ——মা! তোমার কোন কুলে কেহ নাই, তোমার আবার কুলনন্দন কি? তবু মা হইয়াছ বলিয়া আজ কুলের মমতা বড়ই বাড়ি-য়াছে—অথবা তোমার পূর্ব্বকুলই নাই, পরকুল না থাকিবে কেন? পর-কুল যদি না থাকিবে, তবে আমরা কেন আছি মা? তোমার কুল থাক্ বা না থাক্, সকল কুলের মূল মা তুমি স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী, তোমার পথে যে দাঁড়ায় মা, কুলপথ ত তাহারই জন্য; কুলের সাধ মিটিয়াছে মা! একবার কুল ছাড়াইয়া কোলে কর, কুলের মূলে বসিয়া একবার

কুলরহস্য ভেদ করি—ভবনদীর কুলকুলধ্বনি জন্মের মত মিটিয়া যাক্— মা! তোমার সমাধিমগ্ন সমাধিকুমার সে ছুকুল ভেদ করিয়া এ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন বলিয়াই তুমি তাঁহাকে তোমার সাধের "কুলনন্দন" উপাধির অধিকারী করিয়াছ! ধন্য ভক্ত সুরথসমাধি। তোমাদের এ বলি-দানের গম্ভীর রহস্য কলির জীব আমরা কি বুঝিব? ইহা কেবল তোমরাই দিয়াছিলে—আর মা ই বুঝিয়াছিলেন। সাকারসাধক! তুমি সকাম হও বা নিষ্কাম হও, বাহ্যমূর্ত্তিতে মায়ের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, তাহার জন্য কি করিতে হয়, তাহা এই বেলা সুরথ সমাধির নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লও। যে উপাসনায় বাহ্যমূর্ত্তিতে জগ-দম্বার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করিবার জন্য এ হেন সুরথ সমাধির স্ব-হস্তে বক্ষঃস্থল বিদারণ, কলিযুগে আজ্ ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান-পণ্ড পাষণ্ডসমাজে সেই উপাসনার নাম কি না পৌত্তলিকতা! সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বদর্শী মহর্ষি মেধস যাঁহাদিগের মায়াতত্ত্বের উদ্ভেদক, পরতত্ত্ব পথপ্রদ-র্শয়িতা; সেই সসাগরা বসুন্ধরার একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট্ মহারাজাধিরা-জেন্দ্র সুরথ, আর তীব্রবৈরাগ্য-সন্ধুক্ষিত-তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি-সন্দীপিতহৃদয় মহাত্মা সমাধি ইহাঁরাই কি না পুতুল খেলা করিতে গিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া ছিলেন? সাবর্ণিক মনুর প্রতি মানবের এ সমালোচনা কলিযুগের পূর্ণ পরিচয় ব্যতীত আর কি হইবে? সে যাহা হউক, নিজমুখনির্গত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার জন্য যিনি সুরথ সমাধির হৃদয়রক্ত বলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন—"আলো চাল আর বুঁট ভিজানা" তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইবার নহে——অগ্রাহ্য হইবার নহে বলিয়াই সবলে হৃদয় বাঁধিয়া সাধক বলিয়াছেন ——

যত্তস্তে মাতস্ত্বাং দিবি দিবিষদো নিত্যমমৃতৈ-
রপূর্ব্বাহারৌঘৈ র্জগতি জগদীশ্বর্য্যবনিপাঃ॥
অতোদত্তং তোয়ং ফলকুসুমপত্রং ত্যজ ন মে
সমাধত্তে বহ্নিঃ সঘৃতসমিধং প্রাপ্য ন তৃণং?॥

* মাতঃ! দেবলোকে দেবগণ অমৃতদ্বারা নিত্য তোমার অর্চ্চনা ক-রেন, জগদীশ্বরি! জগন্মণ্ডলে অবনীপালগণ অপূর্ব্ব আহারদ্বারা তোমার পূজা করেন, তাই বলিয়া মা! তুমি আমার প্রদত্ত পত্রপুষ্প ফলজল পরিত্যাগ করিতে পার না, মা! যজ্ঞকুণ্ডে সঘৃত সমিধে পূজিত হয়েন বলিয়া বহ্নি কি তৃণ পাইলে তাহা পরিত্যাগ করেন?॥ নিজ দাহিকা-শক্তিবলে বহ্নি, সমস্ত বস্তু আত্মসাৎ করিতে সমর্থ, তাই তাঁহার নাম সর্ব্বভুক্। যে যাহাই কেন প্রদান না করুক, বহ্নির নিকটে তাহাই নি-র্ব্বিশেষে গ্রাহ্য এবং দাহ্য হয়, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্ব-মঙ্গলার উদ্দেশে যাহাই কেন অর্পিত না হউক, সর্ব্বার্থসাধিকা করুণা-ময়ী সাধককে কৃতার্থ করিতে তাহাই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; এ অঙ্গীকার তাঁহার নিজ অভাব পূরণ করিবার জন্য নহে, ভক্তবৎসলার ভক্তরক্ষা—ব্রতরক্ষার জন্য; নতুবা যিনি মহাভাবস্বরূপিণী, সেই ভাব-স্বভাব-প্রভাবময়ীর রাজ্যে স্বরূপতঃ অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই—যদি কোন অভাব থাকে, তবে সে কেবল অভাবের অভাব মাত্র। "আলোচা'ল আর বুঁট ভিজানা"র অভাবও তাঁহার যেমন নাই —মিষ্টান্ন পরমান্ন অমৃতের অভাবও তাঁহার তেমনই নাই, তবে আর "আলো চা'ল আর বুঁট ভিজানা" বলিয়া তাঁহার নিকটে দুঃখই বা কি, লজ্জাই বা কি? সপ্তসমুদ্রমথিত অমৃতভাণ্ডারও তাঁহার নিকটে যে পরমাণু, আলো চা'ল আর বুঁট ভিজানাও সেই পরমাণু; অমৃতগ্রহণেও তিনি যে নিত্য-নির্লিপ্ত, আল চাল বুঁট ভিজানাতেও সেই নিত্যনির্লিপ্ত। স্বরূপতঃ পদ্ম-পত্রসলিলবৎ নির্লিপ্ত থাকিয়াও মায়াময়সংসারলীলার অভিনয়ে ভক্তকে আত্মসাৎ করিবার জন্য এ সকল উপচারাদিগ্রহণে তাঁহার আনন্দের ভান মাত্র, নতুবা নিত্যপূর্ণানন্দময়ীর কোন্ আনন্দের অভাব আছে যে, নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তিনি সেই আনন্দ ভোগ করিবেন? নৈবেদ্যের প্রতিপরমাণুর মধ্যে যে আনন্দময়ী চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিতা, নৈবেদ্য তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিবে, ইহা বড়ই হাসির কথা! তথাপি উপাসনার অধি-

ক্ষারে শাস্ত্র তাঁহার যে আনন্দ উল্লাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আনন্দ——তাঁহার উল্লাস নহে, সাধকের সাধনানন্দ সাধনোল্লাস-বিলাস মাত্র। যথাসময়ে আমরা এ বিষয় প্রপঞ্চিত করিতে সচেষ্ট হইব, এক্ষণে এই মাত্রই বলিবার কথা যে, রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন— তাঁহার মনের দুঃখে প্রাণের কথা,—যে দুঃখ, সাধনার প্রথমাধিকারে পরতত্ত্বের উদ্ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া থাকে ; এ দুঃখ-গাথা জ্ঞানরাজ্যের সিদ্ধান্ত নহে, ভক্তিরাজ্যের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার অস্ফুট আভাস মাত্র। অতত্ত্বপরিচিত অভুক্তভোগী অভক্তসম্প্রদায় কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে এবং অনধিকার প্রবেশের প্রভাবে সেই ভক্তিকাণ্ডের কথাগুলিকে জ্ঞানকাণ্ডের রং দিয়া সং সাজাইয়া পাষণ্ডসমাজে বাহাদুরী দেখাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতে পান নাই যে, মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, একবার যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই এ কাঁচা রং ধুইয়া তখন কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার সন্ধানও থাকিবে না। বড়ই আমোদের কথা এই যে, লোকে রামপ্রসাদের দোহাই দিয়া, রামপ্রসাদের দলের লোক বলিয়া লোক-সমাজে নিজের পরিচয় দিয়া আবার লোকের অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে সেই রামপ্রসাদকেই আপনদলে আনিতে চায়। এত বুদ্ধি যাঁহাদের উদরে, তাঁহাদের উদরে রামপ্রসাদের প্রসাদ-অন্ন জীর্ণ হইবার স্থান কোথায় ? তাহা ত ভাবিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। লোকের জীবনেই কেবল সাধনের পরিচয়, কিন্তু রামপ্রসাদের জীবনে মরণে সমান পরিচয়। তিনি সাকার ব্রহ্ম মানিতেন কি না, সাকার উপাসনা করিতেন কি না, মৃত্যুর পূর্ব্ব-রাত্রিতেও পূজা করিয়া মৃত্যুকালেও মায়ের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সিদ্ধ সাধক মহাত্মা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন। জীবনে ত গানে গানে প্রাণে প্রাণে মূর্ত্তিমতী মায়ের নৃত্য! ইহার পরেও— "রামপ্রসাদের সাকার উপাসনা ছিল না" ইহা যিনি বলিতে পারেন, রামপ্রসাদের আত্মা ছিল না, এ কথাও তাঁহার মুখেই শোভা পায়।

রামপ্রসাদের আত্মসমর্পণের আর একটী গানও আমরা এস্থলে উদ্ধৃত

করিয়া দিতেছি, ইহাতে তাঁহার মনঃপ্রাণ আত্মতত্ত্ব দূরে থাক্, দেহ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্তও কি ভাবে মায়ের আরাধনায় অধিকৃত, তাহা দেখিবার কথা।

এ শরীরে কায কিরে ভাই! (যদি) দক্ষিণার প্রেমে না গলে।
ওরে, এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে, সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে, সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে?
ওরে, না পূরে অঞ্জলি, চন্দন-জবা আর বিল্বদলে॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে, কালীমূর্ত্তি যথা তথা, ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার?
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আমও কি কখন ফলে॥

সাধক একবার এই সময়ে সমালোচককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন্—এ গান কোন্ রামপ্রসাদের?

সমালোচকগণের এই সকল নাস্তিক্যরাগরঞ্জিত সমালোচনা দেখিয়া শুনিয়া অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে, এ সকল অভিনব সূক্ষ্ম-সমালোচনা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী চিন্তা চর্চ্চারই উজ্জ্বলপ্রতিভাচ্ছটা; কিন্তু আমরা বলি, এ প্রতিমাবিরোধিনী প্রতিভা আজকার নহে, যত দিন আলোক ও অন্ধকারের সৃষ্টি; যত দিন হইতে দেবকুলে দৈত্যকুলে চিরবিরোধ; যত দিন হইতে সাগরগর্ব্ভে একাধারে অমৃত ও হলাহলের অবস্থান; যত দিন চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রিকা ও কলঙ্করেখা; যত দিন স্বর্গ ও নরক; পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও বিঘ্ন, দেব ও দানব, মানব ও

পিশাচ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আস্তিক ও নাস্তিক, সাধু ও স্বেচ্ছাচারী, ভক্ত ও পাষণ্ড," তত দিন হইতেই উপাসনারাজ্যে এ রাষ্ট্রবিপ্লব চিরপ্রবাহিত। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গগামী পুরুষও নরকযাত্রা করেন, পাপের প্রভাব প্রবল হইলে জ্ঞানীরও দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়, বিকারগ্রস্ত রোগী হইলে সাধুরও তখন অভক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পানে লালসা হয়; তদ্রূপ জন্মান্তরে ঘনসঞ্চিত দুষ্কৃতি ফলে আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও অনার্য্য-বৃত্তি সব দুরদৃষ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বতএব জীবের হৃদয় অধিকার করে; সে অধিকারেরই ফলাফল এই সমুদায় সমালোচনা ॥ মূলতত্ত্বের চির অ কেবল ফলমাত্রদর্শী আমরা, তাই মনে করি ফল বুঝি কেবল শাখাতেই ফলে; বস্তুতঃ তাহা নহে, সকল ফলের মূলে তিনি, তাঁহারই আজ্ঞায় বীজ অনুসারে বৃক্ষের রস কটু তিক্ত কষায় মধুর হয় এবং সেই রসেই তাহার ফল ফলে। তাই অনেক স্থলে দেখিতে পাই ভগবদ্‌ভক্ত হইলে চণ্ডালের অন্তঃকরণেও ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়, আবার ভগবদ্ বিমুখ হইলে ব্রাহ্মণও তখন চণ্ডাল অপেক্ষা চণ্ডালত্বে পরিণত হয়েন। স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন ভগবান্ ভবানী-পতির শ্বশুর হইয়াও যখন অসুর-বুদ্ধির অবলম্বনে ভগবতী-ভগবচ্চরণে ভক্তিশূন্য হইলেন, তখন ত্রিজগতের পশুপাশবিনাশকারী স্বয়ং পশুপতি, সেই ছিন্নমুণ্ড শ্বশুরের স্কন্ধে পশুর অধম ছাগের মুণ্ড সংযোজিত করিতে অনুমতি করিলেন। আবার, শিবরাত্রি-ব্রততত্ত্বে দেখিতে পাই, সেই পশু-পতিই করুণাবলে পশুঘাতী নিষাদরাজকে ভীষণ শমনসঙ্কট হইতে উন্মুক্ত করিয়া যোগীন্দ্রগণবাঞ্ছিত কৈলাসমন্দিরে উপস্থিত করিয়া নিজচরণশীতল-চ্ছায়ায় চণ্ডালের ত্রিতাপতপ্ত জীবনে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাই "গীতাঞ্জলি" আবার বলিবে——

আমরি! চতুর্ব্বর্গ-ফলবিধাতা শ্রীফলমূলে।
তাই ব্যাধের মৃগয়া-ফলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে॥

গাছে ফল ধরে নানা, লোকে ভাবে সেই ভাবনা ;
গাছে ত ভাই ফল ধরে না, ফল ধরে ঐ মূলের বলে ॥
ব্যাধ রে তোর আশ্রয় তরু, তরু নয় ও কল্পতরু ;
তোর, তরুর মূলে জগদ্‌গুরু, জন্মান্তর সাধনার ফলে ॥
ধন্য তোর মৃগয়াদীক্ষা, ধন্য রে তোর শরশিক্ষা ;
যার বলে স্মরহর ভিক্ষা—গ্রহণ করেন বিল্বদলে ॥
ধন্য তিথি শিবরাত্রি, যার ফলে মা জগদ্ধাত্রী ;
ব্যাধপুত্রে করেন কোলে, ফেলেন না চণ্ডাল ব'লে ॥
আজ, জন্মিয়ে ব্রাহ্মণের কুলে, সেই ব্রত যে আছে ভুলে ;
ওরে, সে যদি ব্রাহ্মণ তবে, চণ্ডাল আর কারে বলে ॥
ঊর্দ্ধে ব্যাধ চণ্ডাল তুমি, তোমার, নিম্নে ত্রিভুবন স্বামী ;
এ তত্ত্ব কি বুঝব আমি, জন্মিয়ে ব্রাহ্মণের কুলে ॥
ভক্তাধীন ভগবান্, রাখিতে ভক্তের মান ;
নিম্নে রেখে আপনার স্থান, ভক্তকে দেন ঊর্দ্ধে তুলে ॥
যদি ভক্তের পতন ঘটে, তখন, ভক্তরক্ষা বিষম বটে ;
তাই, ভক্তবৎসল তরুতলে, ভক্তে কোলে ক'র্‌বেন ব'লে ॥
ব্যাধ তোমারে প্রণাম কর্‌তে, আজ, লজ্জিতে হয় বিশ্বনাথে ;
তাই, দূর হ'তে প্রণাম করি, চণ্ডাল ! তব পদতলে ॥
দাও আশীর্ব্বাদ নিষাদরাজ ! আমার, ব্রাহ্মণত্ব ঘুচে যাক্ আজ ;
চণ্ডালদাদার ভাই ক'রে ভাই, স্থান দাও চণ্ডী মায়ের কোলে ॥
কুলের গাছে তুলেছ ভাই, এবার প'লে আর রক্ষা নাই ;
দোহাই শিবের শিবের দোহাই, হাত্ বাড়ালাম ধর তুলে ॥

—×—

মানবজীবনে এই সকল পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ত্রিকাললোচন ভগবান্ ত্রিলোচন তাহার মূল লক্ষ্য করিয়া সাধক-জগৎকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া যোগিনীতন্ত্রে স্বয়ং বলিয়াছেন——

২য় ভাগে ৮ম পটলে—

তীর্থে প্রাসাদকরণে ধর্ম্মারম্ভে বিশেষতঃ।
ব্রতযজ্ঞসমারম্ভে বিঘ্নানি নিবসন্তি বৈ। ১।
তেষাং সম্পূজয়ে দাদৌ বলিভি মোদকাদিভিঃ।
অন্যথা জায়তে বিঘ্ন মিতি জানীহি মে প্রিয়ে। ২।
অথাপরাণি বিঘ্নানি শরীরে নিবসন্তি বৈ।
মানসানি জ্ঞানজানি পাপানি তান্ শৃণু প্রিয়ে। ৩।
কশ্চিন্নিবর্ত্তকো দেবি কশ্চিৎ প্রবর্ত্তক স্তথা।
সন্নিকর্ষং বিদূরং বা সহস্রং লক্ষ মেব বা। ৪।
পাপানুস্মরণ ঞ্চৈব আলস্যেনাপি দূষণং।
শোকমোহজরাব্যাধি-তারুণ্যধননাশকং। ৫।
কলহং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দুর্ভিক্ষং গৃহসঙ্কটং।
নানাব্রতসমাকীর্ণং ধার্ম্মিকোহস্মীতিমানসঃ। ৬।
প্রাপ্তশোকস্তু ধর্ম্মস্য করণে হীনপাতকং।
বৃক্ষপত্রঞ্চ তুলসী ধাত্রী বৃক্ষফলং তথা। ৭।
শালগ্রামঃ শিলাখণ্ডং প্রতিমা দারুজং তথা।
মানুষং ব্রাহ্মণঞ্চৈব স্বয়ম্ভু র্ব্বর্ত্তুলং শিবঃ। ৮।
শঙ্খঃ শম্বুকভেদঞ্চ খড়্গাঞ্চ মাংসসম্ভবং।
দৃষ্ট্বা দেবান্ ভবেদেবং তীর্থজাতং জলং তথা। ৯।
গঙ্গায়াং বা নদীরূপং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভূমিকা।
ইত্যেতানি চ বিঘ্নানি সংযান্তি চ পুনঃ পুনঃ। ১০।
মন এবোত্তরেন্নিত্যং মন এবাত্র কারণং।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। ১১।

—×—

তীর্থযাত্রায়, প্রাসাদনির্ম্মাণে, বিশেষতঃ ধর্ম্মারম্ভে ব্রতারম্ভে যজ্ঞারম্ভে দৈব ও পার্থিব বিঘ্ন সকল উপস্থিত হয়। ১। সেই সকল বিঘ্নের প্রবর্ত্তক বা

ষ্ঠাতা দেবগণকে কর্ম্মারম্ভের প্রথমেই মোদকাদি বলির দ্বারা সম্যক্
। করিবে ; অন্যথা অনিবার্য্য বিঘ্ন সকল উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চয়
নিবে। ২। এই সকল বহির্বিঘ্ন ভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তার বা সাধকের শরীরেও বিঘ্ন-
ল বাস করে। সেই সকল আন্তরিক বিঘ্ন জীবের মনকে অধিকার করিয়া
াস্থিতি করে এবং জ্ঞানকৃত পাপরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদিগের বিবরণ
।ণ কর। ৩। দেবি! এই মানসবিঘ্ন মধ্যে কোন কোন বিঘ্ন নিবর্ত্তকরূপে
ং কোন কোন বিঘ্ন প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হয়। (ফলতঃ, এই প্রবর্ত্তক
র্ত্তক উভয়বিধ বিঘ্নদল পরস্পার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া কেবল সাধকের
মায়ুঃ ক্ষয় করে ; সুতরাং সে সকল প্রবর্ত্তক বিঘ্নকেও নিবর্ত্তক বিঘ্নেরই
পান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্যথা, কার্য্যের প্রবর্ত্তকবৃত্তিকে শাস্ত্র
খনও বিঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। ঐ সকল প্রবর্ত্তকবৃত্তি কেবল
ন্দেহদোলার রজ্জুবিশেষ)। বিঘ্নবিবরণ——সন্নিকটে হউক, অথবা অতি-
দূরে হউক, সহস্র যোজনের অন্তরেই হউক, কিম্বা লক্ষযোজনের অন্তরেই
হউক, এতদূর হইতেও সেই সকল পাপের বিষয় সমূহের অনুস্মরণ।
আলস্যবশতঃও ধর্ম্মকার্য্যের দূষণ। শোক মোহ, জরা, যৌবন ও ধনের
বিনাশক ব্যাধি। ৪। ৫। ভার্য্যার সহিত কলহ, দুর্ভিক্ষ, গৃহসঙ্কট
. জ্ঞাতিবিরোধ পরিবার বিরোধ ইত্যাদি) নানাব্রত-সঙ্কীর্ণতা (একদা
বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠানে সকল ব্রতেরই অঙ্গভঙ্গ দোষাশঙ্কায় ব্যাকুলতা)
"আমি ধার্ম্মিক হইয়াছি" এই অভিমান। ৬। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান-
কালে কোন পাতক পরিলক্ষিত হইতেছে না, অথচ সংসা শোকপ্রাপ্তি।
তুলসী বৃক্ষপত্র, ধাত্রী বৃক্ষফল, শালগ্রাম শিলাখণ্ড, দেবপ্রতিমা কাষ্ঠ
(ইত্যাদি), ব্রাহ্মণ সাধারণমনুষ্যমাত্র, স্বয়ম্ভূ শিব বর্ত্তুল পাষাণমাত্র। ৭।৮।
শঙ্খ শম্বূকেরই ভেদবিশেষ, গণ্ডারের খড়্গ মাংসবিকারমাত্র, সাক্ষাদ্দে-
বতা এবং দেববিভূতিবর্গ দর্শন করিয়া এই সকল দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব।
তীর্থসমূহ জলমাত্র, গঙ্গা নদীবিশেষ, পুণ্যক্ষেত্রও সামান্য ভূখণ্ড ; এই
সকল অবিশ্বাসরূপ মানসিক বিঘ্ন বারম্বার জীবের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া